যোগ প্রবন্ধে ভারতাত্মা

অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিকা :
যোগিরাজ পাব্লিকেশন-এর পক্ষে
শ্রীমতী অমিতা চট্টোপাধ্যায়
"উষালোক"
২৬/এ/১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
প্রথম প্রকাশ :
২৭শে জানুয়ারী ১৯৬৩
শ্রীপঞ্চমী, ১৩ই মাঘ, ১৩৭০

প্রচ্ছদ : শক্তিপদ ঘোষ
মূল্য : ষোল টাকা
মুদ্রাকর :
নিউ পাল প্রেস
সীতারাম পাল
৬৭/এ, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
বাঁধাই :
স্বরূপ বাইণ্ডার্স
গোপাল বর্মণ
৪৩, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

—তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

প্রকাশিকার কথা

যোগ হল সনাতন ধর্মের মূল। বর্তমান কালে এই যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যাঁকে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু মানুষের জীবনে লাহিড়ী মহাশয় হলেন ধ্রুবতারা। দ্বাপর যুগ এবং কলিযুগের সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পৃথিবীর প্রাণ তরঙ্গকে কলিযুগের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান সে কথা তিনি নিজেই বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই একই ভগবান পুনরায় কলিযুগের শেষে শ্যামাচরণরূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর প্রাণ তরঙ্গকে আবার সত্যযুগের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেলেন। এখানেও শ্যামাচরণ নিজের পরিচয় রাখতে গিয়ে বলেছেন—"আমিই কৃষ্ণ; আমিই মহাদেব; আমিই চতুর্ভূজ নারায়ণ; যা আত্মসূর্য্য তাই ব্রহ্ম তাই আমি শ্যামাচরণ: আমিই আদি পুরুষ ভগবান; আমি স্বয়ং ভগবান; আমিই একমাত্র পুরুষ; আমিই অক্ষর পুরুষ; সর্ব্ব-ব্যাপি আমিই আছি; আমি ছাড়া এজগতে আর কিছু নেই; আমার রূপ থেকেই জগতের প্রকাশ; কুটস্থরূপে সবার ভেতর আমিই আছি; কুটস্থই আমার রূপ; কুটস্থকে দেখলেই আমাকে দেখা হয়।"

তাই "পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী" এবং "শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ ও অদ্বৈতবাদ" লেখকের এই দু'খানি বই আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু মানুষের কাছে বড়ই আদরণীয়। এই লেখকের লেখা বহু প্রবন্ধ যেগুলি বহু ধর্মীয় মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল সেইসব প্রবন্ধগুলির মধ্যে থেকে আঠারটি প্রবন্ধ বেছে নিয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। আশা করি আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু এবং যোগ পিপাসু মানুষের এই প্রবন্ধগুলি তাঁদের চলার পথের সহায়ক হবে এই সনাতন ভারত এবং সেখানকার মানুষ তারা যে কত উচ্চজ্ঞানের অধিকারী তা এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে বোঝা যায়।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	ভারত	১
২।	যোগিরাজ শ্যামাচরণ ও প্রাণধর্ম	৬
৩।	গীতার যোগতত্ত্ব	১০
৪।	গৃহীর ভগবান্	২৩
৫।	ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা	৩৪
৬।	ক্রিয়াযোগ কি শাস্ত্রসম্মত	৪৩
৭।	পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি	৫২
৮।	সদ্‌গুরু	৫৭
৯।	মা অন্নপূর্ণা	৬২
১০।	দুর্গা দুর্গতিনাশিনী	৬৫
১১।	সরস্বতী	৭০
১২।	মা	৭৪
১৩।	শ্যামাচরণ ইধার আও	৭৮
১৪।	পবিত্র সেপ্টেম্বর	৮০
১৫।	জীবসেবা কি মোক্ষদায়ক	৮৬
১৬।	আমি সকলের দাস	৯০
১৭।	ভারত শাসন	৯৪
১৮।	মটরু	১০১

ভারত

আমাদের এই মহান্ ও পবিত্র দেশের নাম ভারত। শুধু তাই নয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে ভারত সম্বোধন করেছেন এবং এক বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থের নামও মহাভারত। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন দেশের নামে মানুষের নাম হয় না। ইংল্যান্ড কোন মানুষের নাম হয় না, তেমনি চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি কোন মানুষের নাম দেখা যায় না। কিন্তু গীতায় 'ভারত' এই নামটি অর্জুনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার যুগ যুগ ধরে এই দেশের নামও ভারত চলে আসছে। অতএব ভারত শব্দটির একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, একটা বিরাট আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্য এই নামটির পেছনে লুকিয়ে আছে।

আমাদের দেশ ঋষিসেবিত। বহু ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আবির্ভূত হয়ে এই ভূমিকে পবিত্র করেছেন, মহাভারত সহ সনাতন ধর্মের বহু শাস্ত্র রচনা করেছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বন্যা বইয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁরা কখনও মানুষের বর্ত্তমান জন্মটাকে নিয়ে বিচার করেননি ; অতীতের বহু জন্ম, বর্ত্তমান জন্ম এবং আগামী বহু জন্ম, এইভাবে বহু জন্মের দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের কল্যাণ করার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য দেশের মনীষীগণ মানুষের কেবল বর্ত্তমান জন্মের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই সবকিছু ব্যবস্থা

করেছেন। ফলে পার্থিব জীবনের সুখের আলো এবং ঐশ্বর্য্যের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন। তাই আজ পাশ্চাত্য দেশগুলি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ কখনই মানুষকে অতুল ঐশ্বর্য্যের দিকে আকৃষ্ট করেননি। তাঁরা জানতেন যতদিন মানুষ জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে থাকবে ততদিন সুখদুঃখ ইত্যাদি অবশ্যই থাকবে। তাই কি উপায়ে মানুষকে জন্মমৃত্যুর অতীতে নিয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। ঋষিরা অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; তাঁরা জানতেন মানুষকে যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে কখনই মানুষ সুখ দুঃখ হাসি কান্নার অতীতে যেতে পারবে না। তাই তাঁরা সকল শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় তার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা সবসময়ই বলেছেন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ঋষিদের চেষ্টা বিফল হয়নি। তাই ভারতের আকাশ বাতাস জল এবং ধূলিকণা সবই আত্মজ্ঞানের চেতনায় ভরপুর। মানুষের রক্ত এবং ধমনীর মধ্যে তাঁরা এই আত্মজ্ঞানের চেতনাকে প্রসারিত করেছেন। তাই ভারতের মানুষ স্থূল ঐশ্বর্য্যে দরিদ্র হলেও আত্মসাধনায় তন্ময়, প্রতিটি ঘরে ঘরে নিত্যপূজা থেকে শুরু করে সমাধিস্থ হবার অপেক্ষায়।

ঋষিরা অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় ভাষা সম্বন্ধেও তাঁদের অনন্ত জ্ঞান ছিল। শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা যেসব বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলিও অত্যন্ত গূঢ় অর্থবহ এবং অধ্যাত্মচেতনায় ভরপুর। এই আত্মচেতনার দিক থেকে যদি আমরা ভারত শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করি তবেই এর

সঠিক অর্থ জানা যাবে। ঐতিহাসিকরা বলেন ভরত রাজার নামানুসারে এই দেশের নাম ভারত হয়েছে। এই ধরণের অর্থ কল্পনাপ্রসূত এবং আত্মচেতনাহীন। তাই এধরণের অর্থ গ্রহণ-যোগ্য নয়, কারণ দেশ বা ক্ষেত্র এবং মানুষ উভয়ের প্রতিই যখন ভারত শব্দটি ঋষিরা ব্যবহার করেছেন তখন অবশ্যই এর পেছনে একটা আধ্যাত্মিক চেতনা লুকিয়ে আছে। এটা কোন ঐতিহাসিকের ব্যবহৃত শব্দ নয়, কারণ ঐতিহাসিকদের পক্ষে আত্মজ্ঞানের কথা বলা অসম্ভব। প্রথমে দেখা যাক ক্ষেত্র কাকে বলে। এ সম্বন্ধে গীতাতেই বলা আছে—"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভি-ধীয়তে।" অর্থাৎ এই শরীরই ক্ষেত্র। এর থেকে বোঝা গেল পৃথিবী পৃষ্ঠটাও যেমন ক্ষেত্র তেমনি শরীরটাও ক্ষেত্র। এরকম অনেক প্রমাণ গীতাসহ সনাতন ধর্মের সকল শাস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে। অনেক প্রমাণ দেখিয়ে কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। গীতার প্রথম শ্লোকই হলো ক্ষেত্রকে নিয়ে—"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ···"। পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং শরীর উভয়ই ক্ষেত্র রূপে গণ্য। তাই দেখা যায় দেশের নাম ভারত এবং মানুষের নামও ভারত। কেন তাঁরা বেছে বেছে 'ভারত' শব্দের ব্যবহার করেছেন! 'ভারত' শব্দের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। 'ভা' অর্থে প্রভা, দ্যুতি, দীপ্তি, আলোক ইত্যাদি। 'র' অর্থে বহ্নিবীজ, তেজস্তত্ত্ব, অগ্নি, উত্তাপ, স্বর্ণবর্ণ ইত্যাদি। 'ত' অর্থে তরণ, পার হওয়া, স্বর্গ, ডোঙ্গা, ভেলা ইত্যাদি। তাহলে ভারত শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো নাভিতে অবস্থিত তেজস্তত্ত্বর দ্বারায় আত্মকর্ম করতে করতে যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করেন

তখন প্রচণ্ড প্রভাসম্পন্ন আত্মজ্যোতি দর্শনে যোগী স্নান পান এবং আত্মজ্ঞান লাভ করেন। যোগীর এই অবস্থাকেই ভারত বলে। অর্জুন হলেন নাভিতে অবস্থিত তেজস্তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন কূটস্থচৈতন্য। এই তেজস্তত্ত্বর দ্বারাই শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বজায় থাকে এবং জীব জীবিত থাকে। যোগী এই তেজস্তত্ত্বকে অবলম্বন করে প্রাণকর্ম করেন। তাই যোগীর প্রাণ-কর্ম করারূপ অবস্থাকেই অর্জুন বলে এবং এই প্রকারে যোগী অধিক প্রাণকর্ম করতে করতে যখন কূটস্থে অনন্ত আত্মপ্রভায় স্থিতিলাভ করেন, তখন যোগীর এই অবস্থাকেই ভারত বলে। অতএব একই যোগী যখন তিনি আত্মকর্মে রত তখন তিনি অর্জুন এবং যখন অনন্ত প্রভাসম্পন্ন কূটস্থজ্যোতিতে অবস্থিত তখন তিনি ভারত। একই যোগীর ভেতরে উভয় অবস্থাই বর্ত্তমান। তাই গীতাতে কখনও অর্জুন কখনও ভারত নামে যোগীকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সনাতন ধর্মের অব্যয় যোগসাধনার মাধ্যমেই এই মহান আত্মজ্যোতি বা সহস্রাংশু দর্শন করা সম্ভব। তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে যোগী হতে উপদেশ দিয়েছেন এবং গীতার মধ্যে সর্বত্র যোগ এবং যোগীর নানান অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রশংসা করা হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে ঋষিরা এই পবিত্র ভূমিতে এই আত্মসাধনার বীজ বপন করেছেন এবং কত মহাপুরুষ এই পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে আত্মজ্ঞানের আলো দেখিয়েছেন। একারণে এখানকার সবকিছুই আত্মজ্ঞানে পূর্ণ তাই এই পবিত্র ভূমির নামও ভারত। ভারত বলতে ভূপৃষ্ঠে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে বোঝায় না,

হিন্দু বা কোন বিশেষ ধর্মকেও বোঝায় না। এই পৃথিবীর যেকোন মানুষ অবিনাশী যোগ সাধনার মাধ্যমে যখনই আত্মসাধনার ঐ অবস্থায় উন্নীত হবে তখনই সে 'ভারত' নামে আখ্যায়িত হবে এবং যেহেতু যেকোন স্থানের মানুষই ওই অবস্থা লাভ করতে সক্ষম তাই সমগ্র পৃথিবীই ভারত নামে আখ্যায়িত। তাই 'ভারত' শব্দের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই, ভূ-পৃষ্ঠের কোন বিশেষ স্থানকে বোঝায় না, কোন বিশেষ ধর্মকেও বোঝায় না। এককথায় সমগ্র পৃথিবী এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত যোগীকে বোঝায়। তাহলে সাধারণ মানুষ কি ভারত নয়? তাও হতে পারে না। কারণ সকল মনুষ্য শরীরে শ্রীকৃষ্ণরূপী কূটস্থ বর্ত্তমান। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই কূটস্থকে জানেনা। সকলের মধ্যেই সহস্রসূর্য্যসম আত্মসূর্য্য বিরাজিত। তাই প্রত্যেকেই ভারত হ্বাওয়া সত্ত্বেও তাদের সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। এই অজ্ঞানতার দরুণ পৃথিবীতে মানুষ নানান ধর্মের স্থাপনা করেছে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি কোনটাই ধর্ম নয়! এগুলি সবই সম্প্রদায়।

তথাপি দেখা যায় যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবীর বিশেষ একটা অংশকে ভারত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর কারণ কি? এর একটাই উদ্দেশ্য হলো যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই বিশেষ ভূখণ্ডটিতে বহু বহু ঋষি মুনি এবং আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে যে ব্রহ্মজ্ঞানের বন্যা বইয়ে দিয়ে গেছেন তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। একারণে মানচিত্রের এই ভূখণ্ডকেও ভারত নামে ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই মহান্ ভারত বর্ত্তমানকালে

ইণ্ডিয়া-তে পরিণত হয়েছে। ভারতের মানুষ ভুলে গেছে তাদের পূর্ব ঐতিহ্য তথা মহান্ আদর্শের কথা। যে আদর্শ অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞানের কথা ভারতীয় মুনি ঋষিগণ অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারায় স্থাপিত করে গেছেন তা বর্তমানের ইণ্ডিয়া-র মানুষ ভুলে গেছে।

যোগিরাজ শ্যামাচরণ ও প্রাণ ধর্ম

"সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে তোমরা যদি আমার স্মরণাপন্ন হও তাহলে যত দূরেই আমি থাকিনা কেন উপস্থিত না হয়ে উপায় কি? তোমাদের কূটস্থের মধ্যেই যখন আমি সর্বদা আছি তখন এই হাড়মাংসের দেহটাকে দেখতে আসার কোন প্রয়োজন? ক্রিয়া করলে মঙ্গল, না করলে অমঙ্গল: ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা। প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই সেবা কর, প্রাণেরই উপসনা কর, প্রাণেরই শরণাপন্ন হও; তাহলেই জগতের প্রাণকে ভালবাসতে পারবে, সর্বজীবে প্রেম আসবে। ক্রিয়া করলেই প্রাণকে ভালবাসা যায়। ক্রিয়া স্বরূপ নৌকায় আরোহন করতে করতে চঞ্চল মন স্থির হয়ে যায় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় যত পাপ আছে সমস্ত বিনষ্ট হয়ে যায়। কেউ পাপী নয়, কেউ পুণ্যাত্মাও নয়, কূটস্থে

মন রাখলে পাপ নেই, মন না রাখলেই পাপ। কেউই স্লেচ্ছ নয়, মনই স্লেচ্ছ।"

এ কথাগুলি হ'ল যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের। তিনি ১৮২৮ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সারাটা জীবন সংসারে থেকে, চাকরী করে সাধারণ লোকের মতো সংসার জীবন নিব্বাহ করেন এবং তারই মাঝে যোগ সাধন করে যোগের উচ্চশিখরে আরোহন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সংসারে থেকেও যোগ পথে সাধন করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। তাই তিনি সকলকে বলতেন স্বোপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ কর, কদাচ পরোমুখাপেক্ষী হবে না এবং যোগ সাধন করে সকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর। তোমরা ভাব স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা সহ একত্রে বসবাস করে সুখে দুঃখে জীবন কাটানোই সংসার। এই জাগতিক সংসার সর্বদাই দেহের সুখ ও মনের সুখ মেটাতেই ব্যস্ত। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ এই সংসারের প্রয়োজন আছে। সংসার না থাকলে দেহলাভ হ'ত না এবং ঈশ্বর সাধন করা যেত না। তাই এই সংসার মোটেও অবহেলিত নয়। আসলে চলার নামই সংসার। জীব অনন্ত কাল ধরে জন্মাছে এবং মরছে। এই ভাবে প্রতি জন্মের পর কিছু দিন একত্রে মিলে মিশে থাকা সেটাকে তোমরা সংসার বল। প্রকৃত পক্ষে, সংসার হ'ল প্রাণের অনন্ত অবিচ্ছেদ্য গতিময় অবস্থা, যে অবস্থার ফেরে পড়ে বার বার আসা যাওয়া। এই গতিই হ'ল সংসার। গতি না থাকলে আসা যাওয়া থাকে না। এই গতিই হ'ল প্রাণের চঞ্চলতা। যোগ সাধনের মাধ্যমে প্রাণের এই অনন্ত গতিকে থামাও, তাহলে সংসার

নেই, তখন তুমি মুক্ত। চঞ্চলতার দরুণ এতদিন তুমি ইন্দ্রিয়ের সাথে পরবাসে ছিলে। এটাই পরধর্ম, তাই তুমি তোমার স্থির রূপ আপন স্বরূপকে ভুলে গিয়েছিলে ; এবার ফিরে যাও তোমার স্ব-স্বরূপে। জন্ম জন্ম ধরে দেহের সেবা অনেক করেছো, এবার দেহীর সেবা কর, নিজের সেবা কর। তাহলে তোমার সঠিক মঙ্গল হবে, ভব রোগ ঘুচে যাবে। ক্ষুধা, রোগ, অভাব এগুলি দেহের ধর্ম, দেহীর ধর্ম নয়। দেহের সেবা করলে দেহীর সেবা হয় না। দেহটা তুমি নও, দেহীটা তুমি, সেই তুমিই চঞ্চলতার দরুণ নিজেকে ভুলে গেছো। স্থিরত্বে যাতে পৌঁছানো যায় তার সেবা না করে যে ব্যক্তি সদাই চঞ্চলতার সেবায় ব্যাস্ত সে সর্বদাই মন্দের সেবা করে। ধর্ম কখনো বহু হতে পারে না। প্রাণের চঞ্চলতার দরুণ ভেদা-ভেদ জাগে, সঙ্কীর্ণতা আসে, তাই তোমরা ধর্ম অনেক মনে কর। আসলে এগুলো ধর্ম নয়, সবই সম্প্রদায়। যেখানে দুই সেখানে দ্বন্দ্ব, কিন্তু যেখানে এক প্রাণধর্ম তা দ্বন্দ্বাতীত। অতএব ধর্ম একটাই তা হল প্রাণধর্ম। এই প্রাণধর্ম ব্যতীত ধর্মের আর যা কিছু আচরণ কর না কেন তা কখনোই সত্য ধর্ম হতে পারে না। মহাদ্যুতি কূটস্থই হ'ল ধর্মের গুপ্তমর্ম।

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর সান্ধিক্ষনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি ঘোষনা করে গেলেন—হে পৃথিবীর মানুষ তোমাদের মঙ্গল কিসে হয় তা তোমরা নিজেরাই জান না। তাই তোমাদের যখনই মঙ্গল করার, হিত করার, আনন্দ দেবার প্রয়োজন হবে তখন তোমাদের কাছে আমি নিজেই আসবো। কিন্তু যেহেতু

আমার কোন ইচ্ছা নেই যেহেতু আমার সমস্ত ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে, তাই আবার তোমাদের কাছে আমার আসাটা হবে অনিচ্ছার ইচ্ছা। যদিও আমার কোন কর্ম নেই তথাপি তোমাদের মঙ্গল করাটাই আমার একমাত্র কাজ। হে প্রিয় মানুষ, তোমার সঙ্গে আমার এই টুকুই পার্থক্য যে আমি উৎসস্থলে পেঁছে গেছি, তুমি এখনও পারনি। তুমি এখনও পথ চলছো, আমার চলার শেষ। তাই তুমি এখনও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, আমার বিশ্রাম। তোমাকে আরও কিছু কাল চেষ্টা করতে হবে, আমার চেষ্টার শেষ। আমি উৎসস্থলে পেঁছে যাওয়ায় সেখানকার সব কিছু জেনেছি, তুমি এখনও পারনি। সেজন্যে হতাশ হয়ো না। আমি তোমাদের যে রাস্তার কথা বলেছি, কারন ঐ রাস্তা ধরেই আমি এসেছি, ওই রাস্তা ধরেই তোমরা উৎসস্থলে চলে এসো। যদি তুমি ক্লান্ত হওয়ায় দ্রুত চলতে না পার ক্ষতি নেই, কচ্ছপের গতিতে এসো, কিন্তু থেমো না, আস্তে আস্তে হলেও চলতে থাক তাহলে এক সময় নিশ্চয়ই পেঁছে যাবে, তোমার আমার উৎসস্থল একই, তাই এখানে এসে যখন তুমি পেঁছিবে তখন তোমাকে আমিই প্রথম অভিনন্দন করে আদর করে ডেকে নেবো। কখন তুমি আসছ তার জন্য প্রতীক্ষায় রইলাম। আমি এখানে পেঁছে জেনেছি এ বড় আনন্দের জায়গা, চিরনির্মল। তোমাদের সকলকে একদিন না একদিন এখানে আসতেই হবে। তবে আর দেরী করছো কেন? তোমরা যাতে আসতে পার, যাতে তোমাদের কষ্ট কম হয় তারজন্য সকল ব্যবস্থা তো করে দিয়েছি, কেবল তোমরা একটু চলতে শেখ, এগিয়ে এসো। যখন এখানে আসবে, তখন তুমি আর আমি এক হয়ে যাবো।

গীতার যোগতত্ত্ব

কোন্ শব্দের কি বানান তা সঠিক জানতে গেলে আমরা অভিধান খুলি এবং অভিধান যা বলে তাই ঠিক। সেরকম ঈশ্বর সাধন সম্বন্ধে গীতা যা বলেন তা অভ্রান্ত এ কারণে বলা হয় সকল শাস্ত্রের মাখন হোলো গীতা। গীতাকে বলা হয় স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই সনাতন ধর্মের মেরুদণ্ড হোলো এই গীতা যদিও হাজার হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল তথাপি আজও সনাতন ধর্মীয় ভারতবাসীর হৃদয়ে এর স্থান সর্ব্বোচ্চ। গীতা কেবল মাত্র একটা গ্রন্থ নয় এবং একে বলা হয় ঈশ্বর সাধনার কারক। পরবর্তী কালে বহু মহাত্মা এই গীতাকে বহুভাবে দেখেছেন, এর ভাব জানবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁরা নিজেরা যেমনভাবে গীতাকে বুঝেছেন তেমনিভাবে অপরকে বুঝিয়েছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নয়, কোনো বিশেষ শ্রেণ, দেশ বা কালের গ্রন্থ নয়। গীতা হলো সর্বকালের এবং পৃথিবীর সকল মানুষের উপযোগী। যদিও গীতার মধ্যে অনেক সময় শ্রীভগবান অর্জুনকে 'ভারত' বলে সম্বোধন করেছেন কিন্তু এই ভারত শব্দটি কোনো দেশকে বোঝায় না বা দেশের অধিবাসীকে বোঝায় না। ভারত ভ+অ=ভা অর্থে দীপ্তি পাওয়া। দীপ্তি অগ্নি বা জ্যোতির হয়। এই দেহ যাঁর

দীপ্তিতে দীপ্তিমান তিনি ভারত। অর্থাৎ এই দেহে নাভিচক্রে যে তেজস্তত্ত্ব তারই দীপ্তিতে সমান বায়ুর আকর্ষণে যে প্রাণাপানের গতি বজায় থাকে অর্থাৎ যে তেজস্বত্তের দ্বারা এই দেহ অবিরত গতিসম্পন্ন সেই চঞ্চল প্রাণসত্ত্বাই ভারত বলে সম্বোধিত। যে বায়ুকে আমরা গ্রহণ করি তাকে বলা হয় শ্বাস এবং যেটা ছেড়ে দিই তাকে বলা হয় প্রশ্বাস। প্রশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার পর নাভিতে সমান বায়ুর আকর্ষণে আবার শ্বাস টেনে নেওয়া হয়। সমান বায়ু যদি আকর্ষণ না করে তবে শ্বাস টানতে না পারায় মৃত বলে গণ্য হয়। এই সমান বায়ু তেজস্বত্তে অবস্থিত, তাই অর্জুনকে বলা হয় ইন্দ্রপুত্র। ই = শক্তি, ন্দ্র = বহ্নি, বহ্নির মতো শক্তি যার অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা। এই প্রাণের দুটো দিক্ আছে, একটা স্থির অপরটা চঞ্চল। এই চঞ্চলতাই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। কিন্তু প্রাণের ওই স্থির দিকটাই মূল বা আদি। স্থিরত্ব আছে বলেই চঞ্চলতার অস্তিত্ব। প্রাণের ওই স্থির দিকটাই ব্রহ্ম, তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে।' এ কারণেই বলা হয় চঞ্চলতাই জীব এবং স্থিরত্বই শিব, চঞ্চলতাই মহামায়া স্থিরত্বই পুরুষ। তাই গীতার সিদ্ধি হোলো প্রাণের জন্ম জন্মান্তরের এই চঞ্চলতাকে অতিক্রম করে স্থির ব্রহ্মে মিলে যাওয়া।

গীতাকে বহু মহাত্মা বহুভাবে দেখেছেন। কেউ দেখেছেন সম্পূর্ণরূপে ভক্তিভাবে, কেউ দেখেছেন দ্বৈতভাবে, দ্বৈতাদ্বৈতভাবে, অদ্বৈতভাবে, বিশিষ্টাদ্বৈতভাবে ইত্যাদি। আবার কেউ দেখেছেন গুরু-শিষ্য সংবাদ ভাবে। গীতার ভেতর এমন এক চাতুরি লুকিয়ে আছে

যাতে করে যিনি যে ভাবেই গীতাকে দেখবেন বা জানতে চাইবেন তিনি সেভাবেই রস পাবেন। তাই এই সমস্ত নানাভাবে বা নানা মতে গীতার ভাষ্য রচিত হয়েছে। কেউ বুদ্ধিগত, বিদ্যাগত, পাণ্ডিত্যগত ইত্যাদি নানাভাবে ভাষ্য করেছেন। কিন্তু গীতা যে মূলত যোগশাস্ত্র এবং যোগীর উপলব্ধগত এই দিকটা প্রায় কেউই লক্ষ্য করেন নি। গীতা যে সম্পূর্ণরূপে যোগশাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা সেকথা গীতাতেই বলা আছে। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বলা আছে—ইতি শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগো-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অমুকযোগো নাম অমুকোঽধ্যায়ঃ। অতএব গীতা যে সম্পূর্ণরূপে যোগশাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা এ বিষয়ে সামান্য পরিসরে আলোচনা করা যাক। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যেমন কর্মমার্গ ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ প্রসিদ্ধ, তেমনি যোগমার্গও আর একটি প্রসিদ্ধ পথ। তাই গীতায় সর্বত্র যোগের কথাই বলা হয়েছে। এই যোগপথে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তত্ত্বকথা আলোচনা করা হয়েছে। তাই গীতা কেবল পাঠ বা আলোচনাত্মক শাস্ত্র নয়, এতে আধ্যাত্মিকমার্গের সাধনোপযোগী কর্ম এবং তার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। গীতার ছয় অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে শ্রীভগবান্ সকলকে যোগী হতে উপদেশ দিয়েছেন, কারণ যোগী ব্যতীত অন্য কেউ গীতাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। তাই গীতা যোগসাধনা ও অনুভবের গ্রন্থ। যোগীর যোগসাধনার মাধ্যমে যা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভব হয় এবং যোগীকে যে সমস্ত স্তর বা অবস্থাগুলি অতিক্রম করতে হয় গীতার মধ্যে সেই কথাই বলা হয়েছে।

কথিত আছে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকালে অর্জুন বিষাদগ্রস্থ হয়ে যুদ্ধ করতে রাজী না হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্ররোচিত করতে রথোপরি যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তাই গীতা। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে যে হাজার হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্র মাঠে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের মানুষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে এবং তেমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে কেমন করে ধর্মযুদ্ধ বলা যায়? ইতিহাসের পাতায় বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বর্ণনা আছে, কেন সেগুলিকে ধর্মযুদ্ধ বলা হবে না? আরো দেখা যায় শত্রুপক্ষের সেনানীর সামনে দাঁড়িয়ে ভগবান্ অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন এবং যোগী হতে উপদেশ দিলেন। আবার যোগী কখনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেন না এবং শ্রীভগবানও অর্জুনের মাধ্যমে বহু মানুষের হন্তার ভূমিকা নিতে পারেন না। এছাড়া গীতার মধ্যে যোগীর যে সমস্ত অবস্থার কথা বলা হয়েছে তেমন অবস্থাপন্ন যোগী কখনই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে সমর্থ নন। যেমন পাঁচ অধ্যায়ের ৮—১০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ যোগীর এক বিশেষ অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"কর্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে যুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ায় যোগী বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞ হন; এরূপ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করেও ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবর্তিত আছে এরূপ নিশ্চয় করে 'আমি কিছুই করি না' এরূপ মনে করে থাকেন এবং অনভিমানবশত কর্ম্মে লিপ্ত হন না। ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয়গণ করছে এই ভাব দৃঢ় হয়। এই প্রকারে সবকিছু ব্রহ্মে সমর্পণ করে এবং

সর্বদা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থাকার দরুণ ফলাশক্তি ত্যাগ করে যিনি কর্ম্ম করেন তিনি সর্বদা স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মে যুক্ত থাকায় পাপ-পুণ্য কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলে থাকলেও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না।" এর থেকে এটা বোঝা গেল যে এমন অবস্থাপন্ন যোগীর পক্ষে অস্ত্র দ্বারা অপরের জীবন নাশ করা বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করা কখনই সম্ভব নয়। এরকম বহু প্রমাণ ঐ গীতার মধ্যে নিহিত আছে। অতএব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এমন যুদ্ধ যা অনন্তকাল ধরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে চলছে তা হোলো প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দু পক্ষের যুদ্ধ। মানুষের মন কখনও প্রবলভাবে সংসারে আকৃষ্ট হয়, আবার কখনো ঈশ্বর সাধন করতে চায়। প্রবৃত্তি পক্ষ বলছে ঈশ্বর সাধন কোরো না, তোমার যা কিছু পার্থিব সুখ তা তোমায় দেব। আবার নিবৃত্তি পক্ষ বলছে ঐ ক্ষণস্থায়ী সুখে তোমার কি লাভ? আমার দিকে এস তাহলে চিরসুখ পাবে। এই দু'পক্ষ সবার ভেতরেই অনতকাল ধরে আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মাত্র আঠারো দিনে শেষ হয়েছিল, কিন্তু এই দুপক্ষের যুদ্ধ শেষ হবার নয়। তাই নিবৃত্তি পক্ষ হলো পান্ডব পক্ষ, প্রবৃত্তি পক্ষ হোলো কৌরবপক্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন কূটস্থ চৈতন্য। এই কূটস্থ চৈতন্যের দ্বারাই মানুষ আত্ম-সাধনে প্ররোচিত হয়। এই দেহই হোলো কুরুক্ষেত্র। দেহ যে ক্ষেত্র সেকথা গীতাতেই বলা আছে—'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র-মিত্যভিধীয়তে'। এই দেহের দ্বারাতেই ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম সাধিত হয়। তাই এই দেহই ধর্ম্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র। পঞ্চতত্ত্বই পঞ্চ পান্ডব, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম। ক্ষিতিতত্ত্ব

অর্থাৎ মৃত্তিকাতত্ত্ব যা মূলাধারে অবস্থিত তাই সহদেব। এজন্য সহদেব বৈদ্যশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। অপ্ হোলো জলতত্ত্ব যা সাধিষ্ঠানে বর্তমান। এই জলতত্ত্ব (রক্ত) হোলো নকুল। তেজস্তত্ত্ব যা মণিপুরে অবস্থিত, তিনি অর্জুন। এই তেজস্তত্ত্ব শ্বেতবর্ণ জ্যোতিরূপ। তাই অর্জুন ইন্দ্রপুত্র। মরুৎ অর্থাৎ বায়ুতত্ত্ব যা অনাহত চক্রে অবস্থিত। ইনিই পবনপুত্র ভীম। যুধিষ্ঠির হলেন ব্যোমতত্ত্ব বা আকাশতত্ত্ব বা শূন্যতত্ত্ব যা বিশুদ্ধ চক্রে অবস্থিত। তাই ইনি ধর্ম্মপুত্র। ধর্ম্ম হোলো যার দ্বারা জীবের পোষণ হয়, স্থিতি হয়। এই স্থিতি অবস্থা আজ্ঞাচক্রস্থ মহাকাশরূপ স্থিরপ্রাণ বা মহাপ্রাণ। সেই মহাব্যোম থেকে ব্যোম-রূপী যুধিষ্ঠিরের উৎপত্তি, তাই তিনি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন অর্থাৎ আকাশতত্ব মহাকাশে লয় হয়েছিলো। অপর চার ভাই পারেনি কারণ সহদেব ক্ষিতিতত্ত্ব অপতত্ত্বে মিশে যায়, নকুল জলস্তত্ত্বে তেজতত্ত্ব মিশে যায়, অর্জুন তেজতত্ত্ব বায়ুতত্ত্বে মিশে যায়, ভীম বায়ুতত্ত্ব ব্যোমতত্ত্বে মিশে যায় এবং যুধিষ্ঠির শূন্যতত্ত্ব মহাশূন্যে মিশে যায়। এ সবই এই শরীরে আছে এবং শরীরের পরিণতিও এই প্রকার। ভগবান্ এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে রথোপরি কেবলমাত্র অর্জুনকেই গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই দেহই রথ। নাভিচক্রে সমান বায়ুতে তেজস্তত্ত্ব দ্বারাই মাধ্যা-কর্ষণ হয়ে থাকে ; তাই জীবের শ্বাস বেরিয়ে গেলেও আবার টেনে নিতে পারে। একারণে অর্জুনই হলেন শ্রেষ্ঠ কর্মী বা বীর। যোগীকে এরকম বীর হতে হয় এবং বীরত্বের সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম-যোগ করতে হয়। যোগীর কর্মই প্রধান। গীতার তিন অধ্যায়ের

তিন শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদের এবং কর্মযোগ দ্বারা যোগীদের সিদ্ধি। তাই গীতার মতে যা নিষ্কাম কর্ম তাই সহজ কর্ম্ম এবং তাই কেবল কর্ম্ম। এই তিনটে নাম আলাদা হলেও একই কর্মকে বোঝায়। ভগবান বলেছেন—'শরীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম।' (গীতা ৪।২১) যিনি শরীরের দ্বারা এই 'কেবল কর্ম্ম' করেন তিনি নিষ্কাম যতচিত্তাত্মা ও ত্যক্তসর্বপরিগ্রহ হওয়ায় পাপপ্রাপ্ত হন না। আরো বলেছেন—"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ" (গীতা ১৮।৪৮)। এই সহজকর্ম প্রথম প্রথম অনভ্যাসের জন্য দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। তাহলে এই কেবলকর্ম, সহজকর্ম্ম বা নিষ্কাম-কর্ম কি? যতপ্রকার সাধন মত বা পথ আছে কোনোটাকেই মহা-ধর্ম বলা হয় নি। শাস্ত্রকার বলেছেন—'প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্য গোচরঃ। সর্ব্বপুণ্যস্য সারোহি পাপরাশিতুলানলঃ।' প্রাণায়াম হোলো মহাধর্ম্ম যা বেদেরও অগোচর, সকল পুণ্যের সার এবং সকল পাপ বিনাশক। এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে গীতাতে বলা আছে—'অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে। প্রাণা-পান-গতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। (গীতা ৪।২৯)। প্রাণবায়ুকে আপনবায়ুতে এবং আপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম কর। এরকম করতে করতে 'কেবল কুম্ভক' অবস্থা লাভ করলে প্রাণের গতি রুদ্ধ হবে এবং প্রাণায়ামপরায়ণ হবে। যখন প্রাণায়াম পরায়ণ হবে তখন রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়গুলিকে বাইরে রেখে দৃষ্টিকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কূটস্থে রেখে শাম্ভবী অবস্থায় নাসাভ্যন্তরচারী হবে। অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের যে গতি আগম-নিগমরূপে বাইরের

দিকে চলছিল তা অভ্যন্তরমুখী হয়ে সুষুম্নাগামী হবে। অভ্যন্তরমুখী এই প্রকার প্রাণায়াম কর্ম সাধারণ মানুষের জানা নেই, তাই ঈশ্বরসাধন পথে কোন্‌টা কর্ম এবং কোন্‌টা অকর্ম তা বুঝতে পারে না। অর্থাৎ কোন্ কর্ম করলে ঈশ্বরকে অর্থাৎ স্হির ব্রহ্মকে লাভ করা যাবে এবং কোন্ কর্ম্ম ঈশ্বর সাধনার অন্তরায় বা অকর্ম তা মানুষ বুঝতে পারে না। তাই চার অধ্যায়ের ষোল শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন কোন্‌টা কর্ম্ম এবং কোন্‌টা অকর্ম্ম এ বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হয়। অতএব যা জানলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হবে তা তোমাকে বলছি। কারণ "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" (গীতা ৪।১৭)। কর্মের গতি বড়ই দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে সঠিক কর্ম যা করলে আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় তা বোঝা খুবই কঠিন। আবার তিন অধ্যায়ের আট শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যা অবশ্য কর্তব্য কর্ম তা কর, কারণ সব কর্ম্ম ত্যাগ করলে শরীর যাত্রা নির্বাহ হবে না। কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল। যার অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাই অবশ্য কর্তব্য কর্ম। এই অজপারূপ কর্মই অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম, কারণ প্রাণবায়ুর দ্বারাই শরীর রক্ষিত হয় এবং প্রাণবায়ুই জীবের আয়ু। সব কর্ম্ম ত্যাগ করলেও শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম চলবেই। এই কর্ম না থাকলে দেহ থাকে না। তাই এই কর্ম না করলে প্রত্যবায় হয়। এ কারণে চার অধ্যায়ের আঠারো শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যিনি কর্ম্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম্ম দেখেন তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং তেমন ব্যক্তি সব কর্ম করেও ব্রহ্মে যুক্ত থাকেন। এমন বুদ্ধিমান

যোগী জাগতিক সকল কর্মকে অকর্ম বলে দেখেন এবং প্রাণ-অপানের কর্ম্মকেই একমাত্র কর্ম বলেন। আত্মার সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে যে চঞ্চল বুদ্ধি তা বুদ্ধিই নয়। দুই অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন—'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।' আত্মাতে অর্থাৎ প্রাণের স্থিরাবস্থাতে যে ব্যক্তি যুক্ত নয় তার আত্ম বিষয়ক বুদ্ধি নেই এবং আত্মাতে অযুক্ত থাকায় প্রকৃত ধ্যান হয় না। জীবের বর্তমানে যে অযুক্ত বুদ্ধি অর্থাৎ চঞ্চল বুদ্ধি তা মিথ্যা। তাই এই চঞ্চল অবস্থা হতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তাও মিথ্যা। এই রকম যুক্ততম অবস্থাতেই প্রকৃত ধ্যানাবস্থা হয়. বিযুক্ত অবস্থায় ধ্যান কোথায়? তাই গীতাধ্যানে বলা হয়েছে—'ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যান্তি যং যোগিনো। যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ'॥ ধ্যানেতে অবস্থিত এবং আত্মাতে তদগত মন এই অবস্থাতে যোগিগণ তাঁকে দেখতে সক্ষম হন, যাঁর আদি অন্ত সুর অসুর এবং দেবতাগণও জানতে পারেন না এমন যে ঈশ্বর তাঁকে নমস্কার। সেই ঈশ্বর কে? এ বিষয়ে ওঁকার গীতা পরিষ্কারভাবে বলেছেন 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়ো বদন্তি, ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণম্॥' মুনিগণ কূটস্থে এই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে দেখেন এবং ঐ পুরাণপুরুষ বিষ্ণুকে ধ্যান করেন।

বর্তমানকালে অনেকেই বলেন কলিযুগে যোগ চলে না। কেন কলিযুগের মানুষ যোগ করতে পারবে না। কলিযুগের মানুষ কি মানুষ নয়? আগের যুগগুলিতে মানুষ যেভাবে জন্মাত মরত এখনও তাই হয়। তখনকার মানুষেরও সংসার ছিল, সুখ দুঃখ

ছিন, এখনও তাই আছে। তাহলে তখনকার মানুষ যোগ করতে পারত, এখনকার মানুষ পারবে না একথা ঠিক নয়। ভগবান্ গীতাতে এমন কথা কোথাও বলেন নি যে কলিযুগের মানুষ যোগ করতে অক্ষম। যদি তিনি একথা বলতেন তাহলে তাঁকে কালদোষে দুষ্ট করা হোতো। বরং ভগবান্ বলেছেন—'যোগকর্ম সুকৌশলম' —যোগকর্ম সুকৌশল যুক্ত। ভগবান্ আরো বলেছেন—'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যাক্ষাবগমং ধর্মং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।' (গীতা ৯।২)। এই যোগকর্ম বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় সকল বিদ্যার মধ্যে রাজবিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অতিগুহ্য এবং পবিত্র থেকেও পবিত্রতম। এই যোগকর্ম প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, সুখে আরামে করা যায় এবং যতটুকু করা যায় তা অব্যয় অবিনাশী। শ্রী ভগবান্ এই যোগকর্মকে সুকৌশলযুক্ত, রাজবিদ্যা, সুখে করা যায় এবং অবিনাশী বলেছেন কেন? এই কারণে বলেছেন যে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়েই এই কর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস সব জীবদেহেই আছে এবং এই গতিই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে অন্তর্মুখী বিজ্ঞানসম্মত প্রাণায়ামের দ্বারা স্থির করাই মূল উদ্দেশ্য এবং জীব স্থির হতে পারলেই সম্পূর্ণরূপে অগতি অবস্থা প্রাপ্ত হলেই নিজেই ঈশ্বর হবে। প্রতিটি জীব স্বয়ংই ঈশ্বর কিন্তু চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় আপন স্বরূপকে ভুলে গেছে। এ কারণেই যোগকর্ম বিজ্ঞান সম্মত এবং অতি দ্রুত ফলপ্রসূ হওয়ায় সুকৌশলযুক্ত। শ্বাস-প্রশ্বাসকে ধরেই যখন এই যোগকর্ম করতে হয় তখন তা সকলেই করতে পারে, কারণ শ্বাস সব দেহেই আছে। তাই এই বিদ্যা রাজবিদ্যা। রাজপথে যেমন সকলের যাতায়াতের

অধিকার আছে, এই কর্ম্মেও সকলের অধিকার আছে। তবে এই কর্ম্ম অত্যন্ত গুহ্যতম হওয়ায় যোগিগুরুর নিকট লাভ করতে হয়। এই কর্ম্মের যে ফল তা প্রত্যক্ষ এবং সাথে সাথে পাওয়া যায়। এখন ঈশ্বরসাধন করলাম, তার ফল পাব আগামী জন্মে অথবা ভবিষ্যতে কোনো এক সময় এরকম অনিশ্চয়তা যোগধর্ম্মে নেই, এ কারণ বিজ্ঞান সম্মত। ভগবান্ আরো বলেছেন এই যোগকর্ম্ম করতে কোনপ্রকার কষ্ট হয় না। এরজন্য সংসার ত্যাগ, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ, বস্তু ত্যাগ খাদ্য ত্যাগ ইত্যাদি কোনো কিছুই বাহ্য ত্যাগের প্রয়োজন নেই। গীতার মতে বাহ্য ত্যাগ ত্যাগই নয়। যে বস্তু আমার নেই এবং না থাকার দরুণ ভোগ করার উপায় নেই, এমন ত্যাগ ত্যাগই নয়। বরং গীতা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন এই সব ভোগ্য বস্তুর প্রতি ইচ্ছা বা বাসনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। সংসার আছে, সংসার কর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন করছি অথচ সংসারের প্রতি মন নেই, আকৃষ্ট নই এটাই সংসার ত্যাগরূপ অবস্থা। স্ত্রী আছে অথচ আকর্ষণ নেই, ধন দৌলত বিষয় আছে অথচ মনে কিছু উদিত হয় না এই অবস্থাই প্রকৃত ত্যাগ অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করাটা সম্পূর্ণরূপে যোগকর্ম সাপেক্ষ। যতই ব্রহ্মবিদ্যারূপ এই যোগকর্ম করা যায় ততই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হয়। যতই এই গতি স্থির হবে ততই চঞ্চল মন নিরুদ্ধ হবে, মনের দৌড় ঝাঁপ থেমে যাবে এবং শেষে স্থির ব্রহ্মের সঙ্গে সদা যুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গেই মিশে যাবে, লয় হবে।

এই যোগই হোলো সনাতন ধর্ম্মের গুপ্ত চাবিকাঠি। পুরা-

কালে সকল ঋষিগণ সংসারাশ্রমে থেকে, গৃহস্থ জীবন পালন করে এই যোগকর্ম করতেন। এই যোগকর্ম ব্যতিরেকে সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব যে আত্মতত্ত্ব সেই আত্মসত্যে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব। অযোগিগণ ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ ইত্যাদি মার্গগুলিকে আলাদা মনে করে কিন্তু যোগীর কাছে এগুলি আলাদা নয়। এগুলি সবই যোগীর যোগসাধনের এক একটি অবস্থা মাত্র। যোগীকে যোগসাধনার মাধ্যমে এই সব স্তর, অবস্থা বা মার্গগুলিকে একে একে অতিক্রম করে তবেই স্থির ব্রহ্মে লয় হতে হয়। বর্তমান কালের মানুষ অতীব ইন্দ্রিয়পরায়ণ, লালসাযুক্ত, অলস, বিষয়াসক্ত এবং স্থূল বিষয়ে আসক্ত। এগুলি সবই প্রবৃত্তিপক্ষের টান। এই প্রবৃত্তিপক্ষের টান অধিক থাকায় নিবৃত্তিপক্ষের আকর্ষণ বড়ই কম। এই জাতীয় মানুষ যখন বর্তমানকালে অধিক তখন তাদের ঈশ্বরে ভক্তি থাকা অসম্ভব। আবার যে ঈশ্বরকে কখনো দেখেনি সে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকাও সম্ভব নয়। হয়তো শোনা কথায় বা আন্দাজে কিছুটা ভক্তিভাবের উদয় হতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃত ভক্তি নয়। প্রকৃত ভক্তি লাভ করা যোগকর্ম সাপেক্ষ। তাই যে জিনিস তাদের ভেতর নেই সেই ভক্তিভাবের দিকে ঠেলে দিলে তাদের পক্ষে ঈশ্বরসাধন করা কি প্রকারে সম্ভব? বরং তাতে অনর্থ হবে। অতএব ভক্তি তাদের প্রথমে অর্জন করতে হবে যোগকর্মের মাধ্যমে। যোগকর্ম করতে থাকলে প্রতিদিন কিছু না কিছু আত্মজ্যোতি প্রত্যক্ষ হবে এবং যতই এই প্রত্যক্ষ বাড়তে থাকবে ততই আরো প্রত্যক্ষ করার প্রবল বাসনা আপনা হতেই জাগবে। এই আকর্ষণটাই প্রেম বা ভক্তি।

তাই যোগীর চেয়ে বড় ভক্ত কোথায় ? তাই বিজ্ঞানসম্মত, ঋষি প্রদর্শিত, সনাতন ধর্মের গুপ্ত চাবিকাঠি-স্বরূপ এই রাজবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যা যা গীতার মাধ্যমে শ্রীভগবান পৃথিবীর সকল মানুষকে করতে উপদেশ দিয়েছেন, তার নিন্দা করে, যদি এই শাশ্বত মহান্ যোগবিদ্যাকে অবহেলা করা হয় তবে তাতে মানুষের মহান কল্যাণ কখনই সাধিত হতে পারে না। অতএব হে পৃথিবীর মানুষ তোমরা অযোগীদের কথা শুনে, যাদের যোগসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, তাদের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা যদি গীতোক্ত এই যোগকর্মকে অবহেলা করো তবে নিশ্চয় করে বলছি তোমাদের মঙ্গল হতে পারে না। যোগকর্ম যদি বর্তমানকালে অনুপযোগী হয় তাহলে গীতায় ভগবানের বাক্য মিথ্যা হয়ে যায়, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। বরং শ্রীভগবান্ বলেছেন— "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" এই যোগকর্ম যদি অল্প স্বল্পও কর তাহলে মহাভয় হতেও ত্রাণ পাবে। শুধু তাই নয়—'শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥' শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ এই যোগকর্ম বা আত্মকর্মই হোলো স্বধর্ম এবং ইন্দ্রিয়দের কর্ম হলো পরধর্ম। অতএব স্বধর্মরূপ এই যোগকর্ম করতে করতে যদি নিধন হয় অর্থাৎ দেহপাত হয় সেও ভাল, তথাপি ইন্দ্রিয়দের কর্মে রত থাকা কখনই উচিত নয়। অতএব—'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥' হে মানুষ তোমারা যোগকর্মকে অবহেলা করে, পরিত্যাগ করে আর দিনাতিপাত কোরো না, ঘুমিয়ে থেকো না। এবার ওঠো এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পক্ষের যে যুদ্ধ তোমার

ভেতর সর্বদা হচ্ছে, অথচ তুমি জান না, সেই যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে লেগে পড়ো অর্থাৎ এই দুই পক্ষের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করো তাহলেই তোমাদের কল্যাণ হবে। 'নহি কল্যাণকৃত কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' এই আত্মসাধনরূপ যোগকর্ম যিনি করেন তিনিই কল্যাণকামী। এই প্রকার ব্যক্তি কখনই দুর্গতিপ্রাপ্ত হন না, একথা শ্রীভগবান্ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন।

গৃহীর ভগবান

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী ভারতের অধ্যাত্ম জগতের ধ্রুবতারা। এই মহান যোগীর কথা বাদ দিয়ে আজকের যুগে যোগসাধনার কথা আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞানী এই মহাযোগী এমনই এক অধ্যাত্মচেতনার ধারক, বাহক ও সঞ্চারক যাতে প্রচারের কোন অবকাশ নেই; বাকচাতুর্য্য, পাণ্ডিত্য ও কচাকচির কোন স্থান নেই; অন্ধ বিশ্বাস, ভাবালুতা ও কল্পনার কোন সুযোগ নেই; যা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও নিজবোধগম্য। একই সাথে তিনি অধ্যাত্মসাধনার সহায়ক এমন এক স্বচ্ছ, সবল, সাবলীল ও আড়ম্বরহীন জীবনদর্শনের পথিকৃত সেপথে

নিভৃতে, নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে আজও লক্ষ লক্ষ গৃহী মানুষ তাঁর অনুগামী। তাঁর সমস্ত জীবন ; কি সাধনা, কি সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের দায়িত্ব পালন, কি অধ্যাত্ম চেতনার বিকাশ—সর্বদিক থেকেই পূর্ণ ও অনুকরণীয়। এমন দৃষ্টান্ত গত হাজার হাজার বছরের মধ্যে দেখা যায় না। অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ায় সমাসীন এমন এক অদ্বিতীয় মহাত্মার কথা বাইরের জগৎ তেমনভাবে জানে না কেন ? তাঁর উক্তিতেই এর উত্তর খোঁজা যাক—"মানবজীবনের পরমকাম্য ; গীতা, বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র সহ সনাতনধর্মের সর্বশাস্ত্রের সারভূত এই যে আত্মসাধনা ; সনাতন ধর্মের চিরশাশ্বত, উদার, নিষ্কলুষ, সংস্কারমুক্ত মুক্তিপথের দিশারী এই যে ব্রহ্মসাধনা ; এতে প্রচারের কোন অবকাশ নেই। যার যখন প্রাণ কাঁদবে তখন আপনা হতেই পেয়ে যাবে। সূর্য্য উঠলে কি ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাতে হয় ?" এই মহাযোগী এমনই প্রচার বিমুখ ছিলেন যে তাঁর একমাত্র যে ফটোটি বর্তমানে পাওয়া যায় তাও সহজে তুলতে দিতে চাননি। বলতেন, "ফটো তুললে আত্মসাধনা বাদ দিয়ে ফটোটিকেই পুজো করতে শুরু করবে। এতে মোক্ষ লাভ হবে না।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (ইং ১৮২৮. ৩০শে সেপ্টেম্বর) আবির্ভূত এই মহাত্মা মানুষের কল্যাণে পরমপ্রেমে এই জগৎকে কি মহামূল্যবান সম্পদ অকৃপণভাবে উজাড় করে দিয়ে গেছেন তা গীতা, বেদ, বেদান্ত, তন্ত্রসহ সনাতন ধর্মের সর্বশাস্ত্রের অনুমোদিত যোগপথের অনুগামী অধ্যাত্মপিয়াসী সাধকরাই অনুভব করতে পারেন। সাধনার মাধ্যমে অন্তর্জগতে যা অনুভব করতে হয় তা

সাধনহীন মানুষ জানবে কি করে? তিনি আর্য্য ভারতের উচ্চকোটীর যোগিপুরুষদের মতো নিজের জীবনে পূর্ণ চতুরাশ্রম পালন করেছেন; সারাজীবন দায়িত্বের সাথে চাকরী করা থেকে শুরু করে ছেলেপুলে মানুষ করা, পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি নিষ্ঠার সাথে করেছেন এবং এরই মাঝে শৃঙ্খলার সাথে এমন এক সাধন করলেন যা তাঁকে সাধনার চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করলো। তাঁর নিজের হাতে বাংলা হরফ অথচ হিন্দী ভাষায় লেখা, গোপনে রেখে যাওয়া এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত ২৬ খানা ডায়রীই তাঁর সাধনার ক্রমোন্নতি, বিভিন্ন পর্য্যায়ে নানাপ্রকার দর্শন শ্রবণ এবং চূড়ান্তে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা প্রকাশ করে। গোপন দিনলিপিতে কোথাও লিখেছেন, "যো আত্মসূর্য্য ওহি ব্রহ্ম ওহি হম শ্যামাচরণ।" কিছুদিন পর এক জায়গায় লিখলেন, "হমহি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।" আরও এগিয়ে গিয়ে লিখলেন, "হমহি আদি পুরুষ ভগবান।" তাঁর লেখা ডায়রীর বিষয় সকল কোন কল্পনাবিলাশ নয়, ভাবের উচ্ছাসে লেখা নয়, আদর্শ বা আবেগ ইত্যাদির কথা নয়; এসব অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের কথা। সাধানার মাধ্যমে নিজ অন্তরে বোধগম্য; আলোচনার বিষয় নয়।

তিনি আমাদের শোনালেন ধর্ম কি। যা সবকিছু ধারণ করে আছে অর্থাৎ যে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অক্ষর, কালাতীত ও সর্বভূতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সত্ত্বা বর্ত্তমান তাই ধর্ম। ধর্ম কোন পৃথক বস্তু নয়, বরং পৃথক ভাবেই অধর্ম। যা ধর্ম তাই ঈশ্বর, তাই ভগবান, তাই ব্রহ্ম। ধর্ম কোন আচার-অনুষ্ঠান নয়; রীতিনীতি

নয় ; ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান ইত্যাদি কোন কিছুই নয়। প্রাণরূপী ধর্ম সকলপ্রকার তর্কবিতর্ক ও সামাজিক সংস্কারবোধের অতীত। এই প্রাণরূপী ধর্ম সবকিছুর মধ্যেই বর্ত্তমান কিন্তু যার মধ্যে বর্ত্তমান তা ধর্ম নয় কারণ তা নশ্বর, কিন্তু প্রাণরূপী ধর্ম অবিনশ্বর। মানুষতো কোন ছার্ ; পশুপাখী, গাছপালা, স্থাবর, জঙ্গম সবারই একই প্রাণরূপী ধর্ম। প্রকাশের তারতম্যে ভিন্ন দেখায়। ইনি কোনকিছুর দ্বারা আবদ্ধ নন। এই যে মহান সত্ত্বা যাঁর কথা আরেঠারে সনাতন-ধর্মের সব শাস্ত্রগ্রন্থ একবাক্যে বলেছেন তাঁকে কি করে সবচেয়ে সহজে অথচ নিশ্চিতভাবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ পাবে সেকথাই যোগিরাজ শ্যামাচরণ বললেন।

এই মনতো সেই পরমসত্ত্বার নাগাল পাবে না। মন স্বয়ং ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় উৎপন্ন বাহ্যিক প্রকাশ। এই মন কি করে তার অতীতে উৎসরূপী পরমসত্ত্বার নাগাল পাবে? তাহলে এই মনের দ্বারা সম্পন্ন পুজোআচচা, জপতপ, বাহ্যধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে তো তাঁকে পাবো না। মরীচিকাদর্শনে যেমন পিপাসা মেটে না : তেমনি মরীচিকাবৎ জপ, পুজো, নাম করা ইত্যাদির দ্বারা জন্মজন্মান্তরের পিপাসা মিটবে না, চঞ্চল প্রাণের তরঙ্গ থামবে না। যোগিরাজ শ্যামাচরণ তাই আক্ষেপ করে বলেছেন—"দর্পণকে ভিতর যো নদী উসসে পিয়াস নহী জাতা।" তিনি মানুষকে মুক্তকণ্ঠে শোনালেন বিভিন্ন দেব-দেবী জ্ঞানের ঊর্দ্ধে যে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান তা লাভ করতেই হবে। দেব-দেবী জ্ঞান সামান্য জ্ঞান, আত্মজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান।

বিভিন্ন দেব-দেবীর সাধনা করলে সেইসেই দেব বা দেবীর দর্শন হবে ঠিকই, কিন্তু সেই দেবদেবী বা আমি তুমি সবার উৎস যে নিশ্চল ব্রহ্ম তার জ্ঞান হবে না। কিন্তু আত্মসাধনা তথা যোগসাধনা করলে বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভিন্ন দেবদেবীর দর্শন, সকল তত্ত্বের অনুভূতি এবং চূড়ান্তে আত্মজ্ঞান লাভ হবে। এরজন্য চাই যোগসাধনা।

কেন মানুষের এতো দুঃখ, এতো জ্বালা ? কেন মানুষ শান্তির আশায় ঘুরে বেড়ায় অথচ শান্তি পায় না ? কেন মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশ ? ইন্দ্রিয় কি, মনই বা কি ? কি করে এদের অতিক্রম করে চিরশান্তি ও চিরবিশ্রাম পাওয়া যাবে ? মহাযোগী শ্যামাচরণ এসবের উত্তর দিলেন। শুধু বললেন নয়, হাতে কলমে বুঝিয়ে গেলেন। শুধু বোঝানোও নয়, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও ক্রমান্বয়ে সাধনক্রিয়ার রহস্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে একেবারে জলের মতো করে জানিয়েও গেলেন। তিনি বললেন, পরমস্থির ব্রহ্মস্বরূপ যে অখণ্ড প্রাণ তাঁরই স্পন্দনশীল চঞ্চলাবস্থার বিচিত্র বিকাশে উৎপন্ন লক্ষ কোটী যে 'চিৎকণা' তাই আমি, তুমি ও আর সবাই। স্পন্দনাবস্থার এই যে বিচিত্র সমারোহ তাই প্রকাশমান জগৎ। এ সবকিছুর মধ্যে সেই অব্যক্ত, চিরস্থির ও শাশ্বত সত্বাই বর্ত্তমান। প্রাণের এই অনন্তপ্রবাহ চিরকাল ধরে চলে এসেছে, চলছে ও চলতে থাকবে। যোগিরাজ বললেন "এই চলার নামই সংসার।" কোন এক সুদূর অতীতে স্থিরপ্রাণরূপী ব্রহ্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে স্পন্দনের মাত্রার তারতম্যে ক্ষুদ্র গুল্ম, লতাপাতা থেকে শুরু করে কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখি এ রকম ৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে তবেই এই মহামূল্যবান

মানব-শরীর পাওয়া গেছে। এটা কেবল ভোগদেহ নয়, সেটা অপচয় ; এ দেহেই মুক্তির জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। প্রাণের স্পন্দনের তারতম্যেই ইন্দ্রিয়সমূহ তথা মনের প্রকাশ। অবিরাম স্পন্দনশীল এই যে মন তার কোন স্থিরত্ব নেই ; তাই শান্তিও নেই। শাস্ত্র বলেছেন 'জীবে দয়া কর।' আমরা জীবদেহের প্রতি দয়া দেখিয়ে মনে করি জীবে দয়া করলাম। এটা সামাজিক কর্ত্তব্য নিশ্চয়ই এবং সামর্থ্য অনুযায়ী করাও উচিত, কিন্তু এতে জীবে দয়া করা হয় না, কারণ দেহটা তো আর জীব নয়। জীব অর্থে প্রাণের চঞ্চলাবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ। জীবে দয়া করতে হবে অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলা-বস্থাকে যোগক্রিয়ার মাধ্যমে স্থির করতে হবে, এক প্রশান্ত, নির্মল ব্রহ্মসত্তায় গিয়ে পেঁছিতে হবে। তবেই নিজের মধ্যে যে জীব তার প্রতি দয়া করা হবে। একাজ একজনের হয়ে অপরে করে দিতে পারে না। তাহলে মনও যেখানে পেঁছোতে পারে না ; সেই সত্তার নাগাল কি করে পাবো ? যোগিরাজ জানালেন সকল শাস্ত্রের সারভূত মহান ক্রিয়াযোগ সাধন করো এবং ক্রমান্বয়ে স্থির হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করো। ইহজীবনেই পরমশান্তির অধিকারী হও। পরজন্মের জন্য ফেলে রাখবে কেন ? কোন না কোন জন্মে করতেই হবে। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি শোনালেন, "ক্রিয়া করলে মঙ্গল, না করলে অমঙ্গল ; ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা।"

কিন্তু এই যে স্থিরপ্রাণরূপী ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁকে কোথায় খুঁজবো ? শ্যামাচরণ বললেন, ঈশ্বর কোন আকাশ থেকে নেমে আসা বস্তু নয়। ঈশ্বর অর্থে প্রাণের স্থিরাবস্থা। সেই চূড়ান্ত স্থিরাবস্থা আমাদের সবার মধ্যেই বর্ত্তমান। শুধু সন্ধান জানি

না কারণ সন্ধান চাই না। এই প্রত্যক্ষ দেবাত্মা কূটস্থরূপে আমাদের সকলের ভ্রূমধ্যস্থলে চিরকাল বিরাজ করছেন। তাঁকে পাওয়াই সব। যোগিরাজ আরও বললেন, "কেউ পাপী নয় কেউ পুণ্যাত্মাও নয়। কূটস্থে মন রাখলে পাপ নেই, মন না রাখলেই পাপ। মনই ম্লেচ্ছ।" বৃথাই আমরা জাগতিক লাভক্ষতির হিসাবনিকাশ করতে করতে নশ্বর দেহটিকে ত্যাগ করি। নিজের মধ্যে না খুঁজে চঞ্চল প্রাণের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বাইরের বস্তুর মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করি; ফলে চঞ্চলতায় থাকতে বাধ্য হই, তাই পাই না। তাঁর খোঁজই যোগিরাজ করতে বলেছেন এবং তাঁতে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে বলেছেন—"অব ন আনা ন জানা।"

তিনি কখনো কোন মন্দির, মঠ, আশ্রম ইত্যাদি স্থাপন করেন নি। বরং বলতেন এসবের সাথে জড়িয়ে পড়ে কোন লাভ নেই। দেহের বাইরে ঈশ্বরকে কোথাও জানা যায় না; এই দেহই একাধারে ধর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। সেই আত্মসত্ত্বাকে নিজের ভেতর জানতে পারলে ভেতর বাহির একাকার হয়ে যায়; একের জ্ঞান হয়। তিনি কোন দল, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী গঠন করেননি; বলতেন, "পচা-পুকুরেই দল হয়"। কখনো তিনি কোন মঞ্চে বা প্রচারসভায় ভাষণ দেননি বরং বলতেন আত্মজ্ঞানের প্রচার নিষ্প্রয়োজন। সারাজীবন চুটিয়ে সংসার করেছেন। রীতিমতো ঝড়ঝাপ্‌টা সংসারের শোক-দুঃখ সয়ে তারই মধ্যে বীরের মতো সাধনা করে উৎসে পেঁছে গেলেন। তিনি নিজেও সংসার ত্যাগ করেননি, অপরকেও তা করতে বলেননি। কোন বাহ্যবেশ পরিবর্ত্তন বা অনাবশ্যক আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিলো, "মনই সংসার।"

যেখানেই যাও এই মন তো সঙ্গে থাকবেই : কাজেই সংসারেই থাকো, সবরকম দায়দায়িত্ব পালন করো এবং তারই মধ্য থেকে সময় বের করে নিয়ে যোগসাধনটি করো তাহলেই ভব সংসার পার হয়ে যাবে। তিনি কোনরকম বাহ্যত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন, বলতেন বাহ্য ত্যাগ কোন ত্যাগই নয়। সংসারে যার যেরকম সুবিধে সেরকমই থাকো, এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না ; শুধুমাত্র অন্তরে চঞ্চল প্রাণটিকে যোগকর্মের দ্বারা স্থির করো ; কেল্লা ফতে।

আজকাল এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে ভক্তি ছাড়া সাধন হয় না। যোগিরাজ বলতেন ভক্তি নিশ্চয়ই চাই কিন্তু ভক্তিলাভ করতে হলে যোগকর্ম করতে হবে, আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। তবেই সঠিক ভক্তি হবে। এর আগে পর্যন্ত যাকে আমরা ভক্তি বলি তা কোন ভক্তিই নয়। পুত্রহীনের পুত্রপ্রেম সম্ভব নয়। আত্মদর্শন ছাড়া ভক্তি হয় না। আবার কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, এরা কেউ আলাদা নয় ; যোগসাধনার ক্রম বিশেষ। যোগের ওপরেই ধর্মের মূল প্রতিষ্ঠিত। চূড়ান্তে ব্রহ্মজ্ঞান তথা আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

দয়াদ্রহৃদয় করুণার ঘনীভূত রূপ যোগিরাজ শ্যামাচরণ নিজেকে গোপন রাখতেন। তবুও আশ্রিতদের কল্যাণে এবং তাদের আত্মিক উন্নতির জন্য তিনি যা করে গেছেন তা বিরল। তিনি সকলের রোগশোক গ্রহণ করতেন, বিপদে আপদে তাঁকে স্মরণমাত্রই বিপদ-মুক্তি ঘটতো। তাঁর করুণা সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই প্রবাহিত হয়েছিলো। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চণ্ডাল, ভারতীয়, অভারতীয় নির্বিশেষে সকলকে সনাতন

ধর্মের এই পরমগুহ্য যোগক্রিয়া দান করতেন বলে সেকালের গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাঁর সমালোচনা করলে তিনি বলতেন, "আমি ব্রাহ্মণের মধ্যে চণ্ডাল দেখি, আবার চণ্ডালের মধ্যে ব্রাহ্মণও দেখি। যদি মানুষের মধ্যে মানুষ দেখি আর সে যদি জিজ্ঞাসা করে তবে তাকে বলে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

দেহ শ্যামাচরণ আজ নেই কিন্তু দেহী শ্যামাচরণ কূটস্থরূপে সকলের মধ্যে চিরবিরাজমান। সে কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। তিনিতো পর নন; তিনি যে জন্মজন্মান্তরে একান্ত আপনার জন; নিজের আসল সত্তা। আমরা সেই পরমসম্পদের খোঁজ রাখি না। কোন কল্পনা নয়, ভাবালুতা নয়, দার্শনিক চিন্তাধারা, পাণ্ডিত্য বা আদর্শের কথাও নয়। এ অতি বাস্তব সত্য। যোগিরাজ নিজেই বলেছেন, তোমরা যে কূটস্থ প্রত্যক্ষ করো তাই আমার আসল রূপ, এই দেহ বা আমি সর্বদা আমি নই। কূটস্থরূপে সকলের দেহে থেকে সকলকে আমিময় অর্থাৎ কূটস্থময় করে নেবার চেষ্টা করি; এইভাবে আমি সকলের মঙ্গল করি তাই আমি সকলের দাস।

তিনি আরও আশ্বাস দিযে বলেছেন হে পৃথিবীর মানুষ তোমারদের মঙ্গল কিসে হয় তা তোমরা নিজেরাই জানো না। তোমার সাথে আমার এটুকুই পার্থক্য যে আমি উৎসস্থলে পেঁছে গেছি, তুমি এখনও পেঁছোওনি। তোমাকে আরও কিছুকাল চেষ্টা করতে হবে, আমার চেষ্টার শেষ। আমি যে রাস্তার কথা বলেছি সে রাস্তা ধরেই উৎসে চলে এসো, থেমো না। এখানে পেঁছে জেনেছি এ বড় আনন্দের জায়গা, চিরনির্মল। এখানে

তুমি আমি একাকার হয়ে যাবো, এক চূড়ান্ত ঐক্যে উপনীত হবো, সারা জগৎসংসার এক অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

যোগিরাজ শ্যামাচরণ গৃহীর জীবনে এক উজ্জ্বল আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতো এমনি করে, এতো সহজ করে, আমাদের মতো করে আত্মজ্ঞান তথা ভগবৎপ্রাপ্তির কথা কেউ বলেননি। সংসারে বাস করে সবরকম ঝক্কি ঝামেলা সয়ে, টাকা-আনা-পয়সার হিসেব রাখতে রাখতে, পাঁচ-দশ প্রকারের দায়িত্ব পালন করতে করতে ও আরো কত কি হ্যাপা সামলাতে সামলাতে বর্ত্তমান যুগের অর্থনৈতিক সঙ্কটগ্রস্থ ও সামাজিক অবক্ষয়ের মুখে পতিত সাধারণ মানুষের কালঘাম বেরিয়ে নাভিঃশ্বাস উঠবার উপক্রম হয়। এতোসব কিছুর মধ্যেও কিছু সময় বের করে ক্রিয়াযোগ সাধন করতে থাকলে আপনা থেকেই ধীরে ধীরে ভেতর থেকে এক নির্মল আনন্দের উদয় হয় যাকিনা বাইরের হাজার ঝামেলাতেও মলিন হয় না। চেষ্টা করলে যে কোন সংসারীর পক্ষেই তা লাভ করা সম্ভব। এতে সংসারও সুখের হবে আবার আত্মজ্ঞানের দিকেও এগোনো যাবে। তিনি তো বলেই গেছেন, "ক্রিয়া করলে, সবরকম বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়"। গীতাও একই কথা বলেছেন "স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। পরমসুখপ্রদ এবং সহজে করা যায় এমন যে যোগসাধন তা আরও করতে করতে শত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও গৃহী মানুষ অমৃতময় জ্যোতির্লোকে পৌঁছতে পারবে তা যোগিরাজ শ্যামাচরণ আমাদের করে দেখালেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করে বহু গৃহী মানুষ উৎসাভিমুখী হয়েছেন ও পরম শান্তিপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনিই গৃহীকে বললেন—

"সংসার ছাড়ার প্রয়োজন নেই। সবকিছু করো। কোনকিছুই কোন বাধা নয়, শুধুমাত্র সুকৌশলযুক্ত যোগসাধনাটি করো তাহলেই হবে। গীতাও বলেছেন, "যোগকর্ম সুকৌশলম", আস্তে আস্তে উৎসে পেঁছে যাবে, পরমশান্তি ও স্থিতিপদ প্রাপ্ত হবে। সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর নিজের মধ্যেই আছেন; নিজের আসল সত্তা বৈ তো নয়। যোগাভ্যাস ও ঈশ্বরলাভ শুধুমাত্র সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগীদের জন্য হতে পারে না। সংসার ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, সংসারেই সকলে জন্ম নেয়, সংসারী মানুষই পৃথিবীকে এতো সুন্দর করেছে। সংসার না থাকলে সৃষ্টি বজায় থাকত না। ঈশ্বর কখনো সংসারী মানুষের প্রতি অকরুণ হতে পারেন না। যে অমর যোগসাধন আর্য্য ভারতে ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিলো, যা কিনা রাজর্ষি জনক, শুকদেব, ব্যাসদেব, যাজ্ঞবল্ক এঁদের মতো গৃহী মহাযোগীর জন্ম দিয়েছিলো, যে পথ ধরে অগুণিত মহাত্মা পার পেয়ে গেছেন; সেই সাধন বাবাজীর নিকট প্রাপ্ত হয়ে পুনঃস্থাপনা করে গেলাম যা কিনা ভবিষ্যতে প্রতি ঘরে ঘরে প্রচারিত হবে। যোগসাধন গৃহীর জন্য সুলভ হবে। আবার ঘরে ঘরে গীতাজ্ঞান প্রচারিত হবে, সাধারণ মানুষের আত্মজ্ঞান তথা মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। মানুষ যতই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে ততোই এই বিজ্ঞানসম্মত অমর যোগসাধনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং অতীতের মতোই গৃহে বাস করে জীবন মুক্তির পথ খুজে পাবে"।

শরীরী শ্যামাচরণ আজ আর নেই, কিন্তু কুটস্থরূপে অবিনাশী তিনি চিরকাল বিরাজ করছেন। তাঁকে জানতে হবে, পেতে হবে, উৎসরূপী স্থিরপ্রাণে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হবে। সংসার ও

সমাজের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে জর্জরিত, ক্লান্ত এবং সংশয়গ্রস্থ মানুষের কাছে যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ এক চূড়ান্ত ভরসা, এক পরম আশ্রয়। তাইতো তিনি "গৃহীর ভগবান"। ১৮৯৫ খৃঃ মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে এই মহাযোগী নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাই তাঁর মহাপ্রয়াণের দিবসে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে সংসারী মানুষ কৃতজ্ঞতায় নতশির।

ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা

ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা। ক্রিয়ার অভ্যাসই বেদপাঠ। ক্রিয়াই যজ্ঞ। এই যজ্ঞ সকলের করা উচিত।

—যোগিরাজ।

যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। তাহলে ক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য যে সব সাধন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেগুলি কি মিথ্যা? একথাই কি যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন? তা কখনই নয়। সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। সেসব কথায় পরে আসা যাবে।

আমরা সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষ ক্রিয়া কাকে বলি? তাকেই ক্রিয়া বলি যে যোগসাধন যোগিরাজ দিয়ে গেছেন, যা আমরা গুরু-পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়ে সাধন করি। এটুকু বললেই কি সব বলা

হোল ? হোল না। ক্রিয়া অর্থে কর্ম। এই কর্ম কি আমরা কেবলমাত্র এই জন্মেই করি ? আগের বহু জন্ম, বর্ত্তমান জন্ম এবং আগামী বহু জন্ম সকল জন্মেই আমরা কর্ম করি, এবং সেই সমস্ত জন্মের কর্মই হোল ক্রিয়া। যখন দেহ আছে তখনও প্রাণের কর্ম আছে, যখন দেহ নেই তখনও প্রাণের কর্ম্ম আছে। প্রাণের কর্ম না থাকলে কখনই জন্ম ও মৃত্যু হতে পারে না, কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব সঠিক ক্রিয়া কাকে বলে এটা বুঝতে হলে প্রথমেই জানবার চেষ্টা করতে হবে— আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আমাকে যেতে হবে। যদিও এগুলি সাধন করে জানার বিষয় তথাপি একটা প্রাথমিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রসম্মত সেই প্রাথমিক জ্ঞানের দিকটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, বাকীটা সাধন করে জানার বিষয়।

প্রথমে দেখা যাক্ ব্রহ্ম কাকে বলে ? শাস্ত্র বলেছেন— নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে। যা নিশ্চল তাই ব্রহ্ম। এটুকু বললেই কি সব বলা হোল ? তা নয়। শাস্ত্রকারেরা সব সময়ই আড়েঠারে বলে গেছেন। কারণ আগেকার দিনে ঋষিরা অল্পকথায় বেশী ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন যা এখন আর দেখা যায় না। এখনকার দিনে বেশী কথায় অল্প ভাব প্রকাশের প্রচলনই দেখা যায়। অতএব ব্রহ্ম বলতে —যা চির নিশ্চল, যাকে কেউ চেষ্টা করেও কখনও চঞ্চল করতে পারবে না, যা চির অপরিবর্তনীয়, যার হ্রাসবৃদ্ধি নেই, যা চির গম্ভীর, চির নির্মল, সদাই একরূপ, যেখানে কোন বাধা নেই, দূর-নিকট সম্পর্ক নেই, যেখানে কোন উৎপত্তি নেই, লয়ও নেই অথচ যা আছে বলে সব কিছু বর্তমান, যা না থাকলে কিছুই থাকা সম্ভব

নয়, যার অস্তিত্বে সবকিছুর অস্তিত্ব, সদাই স্বচ্ছ, জন্মমৃত্যু যাকে স্পর্শ করতে পারে না, যেখানে শব্দ নেই, আলো নেই, অন্ধকার নেই, যেখানে জ্ঞান নেই, অজ্ঞান নেই, যেখানে ভক্ত নেই, ভগবান নেই, যেখানে পিতামাতা নেই অর্থাৎ এককথায় যেখানে কিছুই নেই অথচ সবকিছুই আছে, আবার নেই বলারও কেউ নেই, এমন যে চিরনিশ্চল অবস্থা তাই ব্রহ্ম।

এবারে গীতার কথায় আসা যাক। গীতা বলেছেন—একাংশেন স্থিতো জগৎ। উপরিউক্ত যে চিরনিশ্চল ব্রহ্ম তার একটা অংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই চঞ্চলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হোল এবং তাতেই অবস্থান করল। একাংশ বলতে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের one part কে বোঝায় না। যদি ধরা হয় one part তাহলে অবশিষ্ট অংশে চঞ্চলতা নেই বলতে হবে। যদি তা বলা হয় তাহলে ভুল হবে। অতএব একাংশ বলতে বুঝতে হবে one percentage among the whole অর্থাৎ অনন্তের মধ্যে কেবলমাত্র এক শতাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হোল। তাহলে ঐ এক শতাংশ চঞ্চলতা অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশের মধ্যেই রয়ে গেল। যা পূর্ণ তা চিরকালই পূর্ণ। ১০০ শতাংশ স্থিরতা সবসময় ১০০ শতাংশই থাকবে। তাকে বিভাগ করা সম্ভব নয়। অতএব ১০০ শতাংশের মধ্যে ১ শতাংশ চঞ্চল হয়ে ঐ ১০০ শতাংশেই রয়ে গেল। আবার ঐ এক শতাংশ চঞ্চলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল এবং শেষে পূর্ণ চঞ্চলরূপে প্রকাশ হোল। এইভাবে ঐ এক শতাংশ চঞ্চলতা প্রথমে শূন্য শতাংশ থেকে ১, ২, ৩, ৪ এইভাবে বাড়তে বাড়তে দশগুণবিশিষ্ট হয়ে যখন দশ শতাংশ

তরঙ্গায়িত হোল তখন সেই অবস্থাকে বলে আকাশতত্ত্ব। তাই আকাশতত্ত্ব সবচেয়ে সূক্ষ্ম। পুনরায় ১০ × ১০ = ১০০ শতাংশ তরঙ্গবিশিষ্ট যখন হোল তখন সেই অবস্থাকে বলে মরুৎতত্ত্ব বা বায়ুতত্ত্ব। এই বায়ুতত্ত্ব শূন্যতত্ত্ব অপেক্ষা স্থূল হওয়ায় চোখে দেখা যায় না বটে কিন্তু অনুভূতিগ্রাহ্য। পুনরায় ১০০ × ১০ = ১০০০ তরঙ্গবিশিষ্ট যখন হোল তখন সেই অবস্থাকে বলে তেজতত্ত্ব। এই তেজতত্ত্ব বায়ুতত্ত্ব অপেক্ষা স্থূল হওয়ায় আগুন চোখে দেখা যায় কিন্তু তাপ চোখে দেখা যায় না। তাপ অনুভূতিগ্রাহ্য। পুনরায় ১০০০ × ১০ = ১০০০০ তরঙ্গবিশিষ্ট যখন হোল তখন সেই অবস্থাকে বলে অপ্‌তত্ত্ব বা জলতত্ত্ব। এই জলতত্ত্ব তেজতত্ত্ব অপেক্ষা স্থূল হওয়ায় চোখে দেখা যায়, আবার যখন সূক্ষ্মাকারে বায়ুর সঙ্গে মিশে থাকে তখন অনুভূতি-গ্রাহ্য। পুনরায় ১০০০০ × ১০ = ১০০০০০ তরঙ্গবিশিষ্ট যখন হোল তখন সেই অবস্থাকে বলে ক্ষিতিতত্ত্ব। এই ক্ষিতিতত্ত্বই হোল সবচেয়ে স্থূল। সমস্ত জীব ১০০০০০ তরঙ্গবিশিষ্ট হয়ে ক্ষিতিতত্ত্বে অবস্থান করে। অর্থাৎ জড় এবং চেতন উভয় প্রকাশই প্রাণের ১০০০০০ তরঙ্গে হয়ে থাকে। আবার ১০০০০০ তরঙ্গের তারতম্য অনুসারে জড় এবং চেতনের পার্থক্য হয়। তাই জড় এবং চেতন উভয়ের মধ্যেই প্রাণ বর্তমান। এই ১০০০০০ তরঙ্গই হোল সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ কথা। এখানেই সমস্ত সৃষ্টির পূর্ণপ্রকাশ হয়ে থাকে। অতএব প্রতিটি জীবের অস্তিত্ব হল এক লক্ষ তরঙ্গায়িত অবস্থা। এই অবস্থায় শরীর উৎপন্ন হয় এবং শরীরের ভিতরে ৪৯ বায়ু উৎপন্ন হয়ে কর্মক্ষম থাকে। এইসব বায়ুর

দ্বারায় সকল ইন্দ্রিয় ও রিপু উৎপন্ন হয়ে কর্ম্মক্ষম হয়। রক্ত, ধমনী, হৃদস্পন্দন ইত্যাদি সকলেই কর্মক্ষম হয়। চোখ দেখে, কান শোনে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সকলেই কাজ করে। তাহলে এটা বোঝা গেল যে প্রাণের এই ১০০০০০ তরঙ্গের মধ্যে মূল হল ঐ স্থিরাবস্থা। কারণ ঐ স্থিরাবস্থা না থাকলে তরঙ্গের কোন অস্তিত্বই সম্ভব নয়। তাই স্থিরত্বকেই ব্রহ্ম বলে। তাই ঋষিরা বলেছেন—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। তরঙ্গের পরিবর্ত্তন আছে কিন্তু স্থিরত্বের কোন পরিবর্ত্তন নেই। তাই স্থিরস্বরূপ পরিণাম সত্য ব্রহ্মই সবকিছুর মূল। এই পরিণাম সত্য স্থির ব্রহ্ম কিভাবে তরঙ্গায়িত হয় এবং পুনরায় স্থিরত্বে ফিরে আসে তা নীচের ছকটি দেখলে বোঝা যায় ঃ—

১০০% স্থির—১% চঞ্চল।

সহস্রার (তত্ত্বাতীত)	O	১০০ শতাংশ নিশ্চল ব্রহ্ম
		× ০
আজ্ঞা (তত্ত্বাতীত)	O	= ০ শতাংশ······
বিশুদ্ধ (ব্যোম)	O	= ······১০ শতাংশ
		× ১০
অনাহত (মরুত)	O	= ১০০ শতাংশ ↓
		× ১০
মণিপুর (তেজ)	O	= ১০০০ শতাংশ
		× ১০
স্বাধিষ্ঠান (অপ্)	O	= ১০০০০ শতাংশ
		× ১০
মূলাধার (ক্ষিতি)	O	১০০০০০ শতাংশ

উপরের ছকটি থেকে বোঝা গেল যে, স্থির ব্রহ্মের একাংশ

কিভাবে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত সৃষ্টির রচনা হল এবং জীব বেঁচে থাকল। এবার দেখতে হবে মৃত্যু কাকে বলে? মৃত্যু অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে স্থিরত্বের দিকে ফিরে যাওয়া। একজন মানুষের শরীর খারাপ হল, সে অসুস্থ হল। তখন তার মূলাধারের অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বের তরঙ্গ কমে গিয়ে স্বাধিষ্ঠান অর্থাৎ অপ্‌তত্ত্বে চলে গেল। এই অবস্থায় ডাক্তার ডাকা হল, তিনি ঔষধ দিলেন, কিন্তু কিছুই হল না। তখন স্বাধিষ্ঠানের তরঙ্গ কমে গিয়ে মণিপুরে অর্থাৎ তেজতত্ত্বে চলে গেল। তখন বড় ডাক্তার ডাকা হল। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। এর-পর প্রাণের তরঙ্গ কমে গিয়ে অনাহতে অর্থাৎ মরুৎতত্ত্বে গেল। এ অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া হল, বহু চিকিৎসা করা হল, কিন্তু কোন ফল হল না। ডাক্তারবাবু বললেন,- আর কিছু করার নেই, এবার ভগবানকে ডাকুন। এরপর প্রাণের তরঙ্গ বিশুদ্ধ চক্রে অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্বে গেল তখনি মৃত্যু হল। তাহলে দেখা গেল প্রাণের তরঙ্গ যতক্ষণ একলক্ষে ছিল, ততক্ষণ জীব জীবিত ছিল এবং সুস্থ ছিল। সেই প্রাণের তরঙ্গ প্রাকৃতিক কারণে কমতে কমতে যখন বিশুদ্ধচক্রে অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্বে এল, যেখানে প্রাণ মাত্র দশ শতাংশ তরঙ্গায়িত, তখন জীবের মৃত্যু হল। তাহলে মৃত্যু-কালে প্রাণ কিছুতেই দশ শতাংশের ঊর্দ্ধে যেতে পারে না। অতএব মৃত্যুর পর প্রাণ ব্যোমতত্ত্বে থাকতে বাধ্য হয়, কিছুতেই শূন্য শতাংশে যেতে পারে না। এই অবস্থায় দশ শতাংশ তরঙ্গের সঙ্গে তার ফেলে আসা জীবনের সমস্ত কর্মসংস্কার বীজাকারে থেকে যায়। এই কর্মসংস্কার জীবকে পুনরায় জন্মের দিকে আকর্ষণ

করে এবং দশ শতাংশ প্রাণের তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে যখন একলক্ষ তরঙ্গে উপনীত হয় তখনই তার পুনরায় জন্ম হয়। তাহলে বোঝা গেল যে জন্ম থেকে মৃত্যু হল প্রাণের একলক্ষ তরঙ্গ থেকে দশ শতাংশ তরঙ্গে ফিরে যাওয়া এবং জন্ম হল দশ শতাংশ তরঙ্গ থেকে ক্রমান্বয়ে একলক্ষ তরঙ্গে ফিরে যাওয়া। এটাই হল জন্ম মৃত্যুর পরিধি। তাই জীব কোনপ্রকারে যদি দশ শতাংশ প্রাণের চঞ্চলতাকে অতিক্রম করে শূন্য শতাংশে পেঁছিতে পারে তাহলেই সে তার উৎসস্থলরূপ স্থির ব্রহ্মে মিশে যেতে পারবে, আর তাকে জন্মমৃত্যুর চক্রে আসতে হবে না। কারণ এ অবস্থায় প্রাণের কোন প্রকার তরঙ্গ না থাকায় কর্মসংস্কার নেই এবং কর্মসংস্কার না থাকায় আকর্ষণ নেই এবং আকর্ষণ না থাকায় জন্ম নেই, অতএব মৃত্যু নেই। যেখানে তরঙ্গশূন্য সেখানে কিছুই থাকা সম্ভব নয়। তাহলে দেখা গেল একশত শতাংশ নিশ্চল ব্রহ্ম থেকে যে এক শতাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে একলক্ষ তরঙ্গে উপনীত হয়েছিল তাকে যেভাবেই হোক পুনরায় সেই একশ শতাংশ স্থির ব্রহ্মে মিলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এই মিলিয়ে দেওয়াটাকেই লয় যোগ বলে। কিন্তু মিলিয়ে দেওয়ার উপায়টা কি? এই উপায়টা হল—"যোগ কর্ম সুকৌশলম্"। জীব আপনা হতেই মৃত্যুর সময়ে প্রাণের দশ-শতাংশ চঞ্চলতা পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু সু কৌশলযুক্ত যোগ এই দেহে একলক্ষ তরঙ্গ থেকে দশ শতাংশকে অতিক্রম করে শূন্য শতাংশে পেঁছে দিতে পারে। তাই 'যোগকর্ম সু কৌশলম্" অর্থাৎ super science.

পৃথিবীতে এমন কোন বিজ্ঞান আজও আবিষ্কার হয়নি যা জীবের

প্রাণের এই জন্মজন্মান্তরের তরঙ্গকে শূন্য শতাংশে পেঁছে দিতে পারে। একমাত্র সু-কৌশলযুক্ত যোগ কর্ম্মই সক্ষম। তাই আমি মূলতঃ এবং আদিতে স্থির কিন্তু হয়ে গিয়েছিলাম চঞ্চল, আবার ফিরে গেলাম স্থিরে। সকল জীবসহ সমস্ত সৃষ্টি অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এই একই নিয়মসূত্রে বাঁধা।

কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত ক্রিয়াযোগের দ্বারায় জীব শূন্য ব্রহ্মে যেতে পারে এবার সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। যোগিরাজ বলেছেন---"দশ লাখ একষট্ হাজার প্রাণায়ামমে কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হোতা হ্যায়"। মূলাধার থেকে বিশুদ্ধ পর্যন্ত এই পাঁচটি চক্রে পাঁচ তত্ত্ব (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) বর্তমান। প্রতি দুই লক্ষ অন্তরমুখী প্রাণায়ামে এক এক চক্রের প্রাণের তরঙ্গ থেমে যাবে। এইভাবে যোগী যখন দশ লক্ষ প্রাণায়াম করতে সক্ষম হবে তখন যোগী বিশুদ্ধ চক্রে পেঁছে যাবে যেখানে প্রাণের মাত্র দশ শতাংশ তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকবে। এই দশ শতাংশ তরঙ্গায়িত অবস্থা হল জীবের মৃত্যুর স্থান। এই অবস্থায় পেঁছালে যোগী তখন আপনা হতে এই দেহেই মৃত্যুর অবস্থাকে জানতে সক্ষম হবে। ফলে তার আর মৃত্যুভয় থাকবে না। বাকী প্রাণের দশ শতাংশ তরঙ্গকে থামাতে আরও একষট্টি হাজার প্রাণায়াম করা প্রয়োজন হয়। এইভাবে যোগী অন্তরমুখী প্রাণায়ামের দ্বারায় স্থিরব্রহ্মে মিশে যান। এ জন্মে যোগী যতখানি প্রাণায়াম করবে, তার প্রাণের তরঙ্গ নিশ্চয়ই ধারাবাহিক ভাবে বা ক্রমান্বয়ে ততখানি কমবে। এক দুই জন্ম এইভাবে জীব প্রাণায়াম করতে থাকলে অবশ্যই প্রাণ থেমে যাবে এবং স্থিরব্রহ্মে মিশে যাবে।

জীবের এই সাধন কর্মটাকেই অর্থাৎ প্রাণকে থামাবার প্রক্রিয়াটাকেই বলা হয় "ক্রিয়াযোগ"। তাই যোগিরাজ বলেছেন—"প্রাণায়ামসে ব্রহ্মজ্ঞান হোতা হ্যায়"। সু-কৌশলযুক্ত এই প্রাণায়ামই ধীরে ধীরে জন্ম-জন্মান্তরের প্রাণের অনন্ত গতিকে থামিয়ে স্থির ব্রহ্মে যুক্ত করে দিতে পারে। তাই একে ক্রিয়াযোগ বলা হয়। যে জীব স্থিরব্রহ্ম হতে চঞ্চলতার দরুণ বিচ্যুত হয়ে লক্ষ লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করছিল এবং কর্মপাশে বন্ধ হচ্ছিল, সেই জীব এই ক্রিয়াযোগ সাধন করে অবিলম্বে স্থিরব্রহ্মে অর্থাৎ তার উৎস স্থলে ফিরে গেল। প্রাণের এই ধারাবাহিক অনন্ত চঞ্চলতার দরুণ তাকে হয়ত আরও হাজার হাজার জন্ম অতিক্রম করতে হত, কিন্তু সেই জীব এই ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে অচিরে তার উৎসস্থলে ফিরে গেল।

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় জানতেন যে কোটি কোটি জীবের প্রাণের এই অনন্ত চঞ্চলতাকে থামাতে পারলেই সত্যিকারের সকলের মঙ্গল হবে। জীবের জাগতিক মঙ্গলকে তিনি সত্যিকার মঙ্গল বলে মনে করেননি। কারণ এই জাগতিক মঙ্গল সব সময়েই ক্ষণস্থায়ী। তাই তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল জীবের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য। এ কারণেই তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং বঞ্চিত গৃহস্থ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ক্রিয়াযোগের প্রচলন করেছেন। তিনি জানতেন যেহেতু যোগসাধন অবিনাশী সেহেতু যে মানুষ এ জন্মে ক্রিয়াযোগ সাধন কিছুটা করবে, সে পরবর্তী জন্মে অবশ্যই এ সাধন পাবে এবং এভাবে এক দুই জন্ম সাধন করে প্রাণের অবশিষ্ট তরঙ্গকে থামিয়ে স্থিরব্রহ্মে মিশে যেতে পারবে। এই উদ্দেশ্যেই

গীতা বলেছেন—স্ব-ধর্ম্মে নিরত থেকে যদি দেহের নাশ হয় তথাপি কখনও পরধর্মে অর্থাৎ বিপক্ষীয় ইন্দ্রিয়ধর্মে রত থাকা উচিত নয়। স্ব-ধর্ম অর্থে নিজ ধর্ম বা প্রাণধর্ম। ক্রিয়াযোগের এই মহান্ বিশালত্বের (Super science) জন্যই যোগিরাজ বলেছেন—"ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা"। কারণ ক্রিয়াযোগ ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন কর্ম নেই বা আজও আবিষ্কৃত হয়নি যা প্রাণের অনন্ত তরঙ্গকে থামিয়ে শূন্য শতাংশে পেঁছে দিতে পারে।

ক্রিয়াযোগ কি শাস্ত্র সম্মত ?

আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখাও।

যে কোন আদর্শ আগে নিজের জীবনে অনুষ্ঠান করে তারপর অপরকে শিক্ষা দিতে হয়, ইহাই মহাজন বাক্য এবং ইহাই ঠিক। যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী, ভারতের এক মহান সন্তান, যিনি পুরোপুরি গৃহী জীবনযাপন করলেন এবং সাধনার শীর্ষ-স্থানে পেঁছে ব্রহ্মজ্ঞানীতে পরিণত হলেন। এমন আদর্শ আর কেহ স্থাপন করতে পারেননি। সাধক সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়। এক, যারা ঈশ্বরকে চায় না কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্য্যকে চায়। দুই, যারা ঈশ্বরকে চায়, তাঁর ঐশ্বর্য্যকে চায় না। প্রথম সাধকই বেশী, কিন্তু দ্বিতীয় বড় কম। কম হলেও তাদেরই প্রকৃত সাধক বলা যায়। তাই দ্বিতীয় প্রকারের যেসব সাধক, যাদের মুমুক্ষু

বলা হয়, অথচ যারা সংসারে থেকে ঈশ্বরকে পেতে চায় সেই সব সংসারী মানুষের জন্য যে আদর্শ যোগিরাজ দিয়েছেন তাহা আর কেহ বর্তমান কাল পর্য্যন্ত দিতে পারেননি। কারণ এই ধরণের মুমুক্ষুরা সাধারণতঃ সংসার ছেড়ে চলে যান, না হয় সংসারে থেকেও পরগাছা হয়ে জীবনযাপন করেন। কিন্তু যোগিরাজ তা করেননি। তিনি নিজ রোজগারে স্ত্রীপুত্র আত্মীয় সকলকে নিয়ে সংসারে থেকেছেন এবং তারই মাঝে সাধনা করে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছেন। এ আদর্শ বিরল। তাই সংসারী মানুষ কোনদিন তাঁকে ভুলবে না।

তাঁর প্রদর্শিত সাধনপথকে বলা হয় ক্রিয়াযোগ। যোগ নাম শুনে অনেকেই ভয় পান। কিন্তু যোগ ছাড়াতো সাধনা হয় না। যোগ অর্থাৎ মিলন। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটানই যোগ অর্থাৎ যুক্ত করান। যিনি যে পথেই সাধনা করুন না কেন সবই যোগ। সব সাধকের একই উদ্দেশ্য জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন ঘটান। গীতাতে ১৮টি অধ্যায়ের সবই যোগ। বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি। অতএব কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি যিনি যে পথেই সাধনা করুন না কেন সবই যোগ। অতএব যোগ নাম শুনে ভীত হবার কিছু নাই।

ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম। কর্ম্ম ছাড়া ত কিছু হয় না। যাহা কিছু আমরা পেতে চাই, দিতে চাই সবই কর্ম্ম পদবাচ্য। বিনা কর্মে কিছু পাওয়া যাবে না, অতএব বিনা কর্মে ঈশ্বরকেও পাওয়া যাবে

না। ঈশ্বরকে পেতে গেলেও অবশ্যই কিছু কর্ম করতে হবে। জাগতিকভাবে আমরা যত প্রকার কর্ম করি সেই কর্মগুলির মাধ্যমে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে ? সে রকম কর্ম্ম সকলেই করে, তাহলে কেন সকলে ঈশ্বরকে পায় না ! জপ, ব্রত, দান, সৎকর্ম্ম, তীর্থ-ভ্রমণ, পরোপকার, অতিথিসেবা, জীবেদয়া ইত্যাদি কর্ম্মগুলি সকলেই কিছু না কিছু করে থাকে। তাহলে তারা ঈশ্বরকে পায় না কেন ? অতএব এই কর্ম্মগুলি দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এগুলি করলে মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়, এগুলি সাধন পথের সহায়কারি, অতএব এগুলি করণীয়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে। সেই নিষ্কাম কর্মটি কি ? যে কর্ম্মের সহিত কর্মকারীর কোন প্রকার কামনা বাসনা জড়িত নাই তাহাই নিষ্কাম। কামনা করে কে ? ইচ্ছা। ইচ্ছা না থাকলে কোন কামনা থাকে না এবং কর্ম্মও হয় না। যে কোন কর্ম্মের আগে ইচ্ছা অবশ্যই থাকে। ইচ্ছাই কর্ম করায়। অতএব যতক্ষণ ইচ্ছার দ্বারায় কর্ম্ম করা হবে ততক্ষণ সেই কর্মে কামনা অবশ্যই থাকবে। তাহলে নিষ্কাম কর্ম বলে ত কোন কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীভগবান যখন বলেছেন তখন নিষ্কাম কর্ম নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। সেটা হল যে কর্ম্ম কোন প্রকার ইচ্ছার দ্বারায় সম্পাদিত হয় না তাহাই নিষ্কাম। কর্ম করিব ইহা যেমন ইচ্ছা, কর্ম্ম করিব না ইহাও তেমনি ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয় প্রকারই থাকবে না অথচ কর্ম্ম হবে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। আমরা গভীর মনোযোগের সহিত যখন কোন কর্ম্ম করি বা যখন গভীর নিদ্রায় থাকি তখন আমাদের ইচ্ছা থাক বা না থাক

শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম অবিরাম হয়ে চলেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেব কি নেব না এর ধার সে ধারে না। সে আপন গতিতে হয়ে চলেছে। কিন্তু চলেছে ভুল পথে অর্থাৎ উল্টা পথে। তাই জীব দুঃখ-কষ্ট পায়, মারা যায়। এই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কর্ম্মকে সঠিক পথে চালনা করবার যে উপায় তাহা যিনি দেখিয়ে দেন তিনি গুরু। কারণ এই কর্ম করলে সাধক জন্ম-মৃত্যুর হাত হতে রেহাই পায়। ক্রিয়াযোগে সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ সংসারে থেকে সকল কর্ম করবে এবং তারই মাঝে মাঝে এই ক্রিয়া অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করে যেভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহাকেই ক্রিয়াযোগ বলে। ইহা সুসুখম্ অর্থাৎ সুখে ও আরামে করা যায় এবং যদি ঠিকমত করা যায় তাহলে ইহজীবনেই ব্রহ্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। ক্রিয়াযোগের অপর নাম কর্মযোগ বা প্রাণকর্ম। প্রাণের কর্মকেই প্রাণকর্ম বলা হয়। প্রাণ একই কিন্তু তার অবস্থা দুইটি। একটি স্থির অপরটি চঞ্চল। স্থির অবস্থাটাই আদি প্রাণ, তাহার কর্ম চঞ্চল প্রাণ। চঞ্চল প্রাণ হইতে মন, মন হইতে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। জীব ইচ্ছার দ্বারায় কর্ম করে।

এখন দেখা যাক ক্রিয়াযোগ কিভাবে মানুষকে ব্রহ্মের সান্নিধ্যে পেঁছে দেয়। ইহা কি শাস্ত্রসম্মত? যদি শাস্ত্রসম্মত হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম সান্নিধ্যে পেঁছাইতে অবশ্যই সক্ষম হইবে। এবং যদি শাস্ত্রসম্মত হয় তাহা হইলে মুমুক্ষু গৃহীদের ইহা করিতে বাধা কোথায়? বরং করাই উচিত। কারণ যোগিরাজ নিজ জীবনে প্রমাণিত করেছেন যে সকল গৃহীর পক্ষে ইহা উপযুক্ত।

শাস্ত্র কাকে বলে? শা শব্দে শ্বাস, স্ত্র শব্দে অস্ত্র। অর্থাৎ

শ্বাসরূপী অস্ত্রই শাস্ত্র এবং এই শ্বাসরূপী অস্ত্র যিনি চালনা করেন তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ এগুলিকেও শাস্ত্র বলা হয়। কারণ এই শ্বাসরূপী অস্ত্র চালনা করে যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ হয়েছেন তাঁরা তাঁদের অনুভূতির বিষয় যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করেছেন সেই বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতিও শাস্ত্র পদবাচ্য। তাই ঐগুলিও প্রামাণিক।

এবার দেখা যাক ঐ প্রামাণিক শাস্ত্রগুলি ক্রিয়াযোগকে অনুমোদন করে কিনা। ক্রিয়াযোগে পাঁচটি অঙ্গ আছে। তালব্য, প্রাণায়াম নাভিক্রিয়া, যোনিমুদ্রা ও মহামুদ্রা। এই পাঁচ অঙ্গের সমষ্টিকে লইয়াই ক্রিয়াযোগ। তালব্যের দ্বারা খেচরী সাধন হয়। সাধন করতে হলে খেচরী কতখানি প্রয়োজন? রাজার যতখানি মুকুট প্রয়োজন। সমগ্র ক্রিয়াযোগের মধ্যে প্রাণায়াম প্রধান. অন্যগুলিও অবশ্য করণীয়। প্রাণায়াম একপ্রকার শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম। ইহা করিলে প্রাণ ও অপান বায়ু স্থির হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন "বায়ুমারোহধর্মণাঃ পবমানস্য বিশ্ববিৎ।" (ঋগেদ) অর্থাৎ বায়ু ক্রিয়া করিয়া মস্তকে আরোহন করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকা এই ধর্ম। ঋগেদ আরও বলিতেছেন "পাবনং পরব্রহ্ম শুক্রং জ্যোতিঃ সন্তি নঃ ক্রিয়া।" অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় অর্থাৎ কর্মের অতীত অবস্থায় থাকাতে পবিত্র হয়, তারপর ব্রহ্মে লীন হয়, এই যোগীদের বীর্য্য হইতেছে। কাঁটা দিয়া যেমন কাঁটা তুলিতে হয় অর্থাৎ কাঁটাহীন হওয়া যায় তেমনি কর্ম করিয়াই অর্থাৎ প্রাণকর্ম করিয়াই কর্মের অতীত অবস্থায় পৌঁছান যায়। "অগ্নিমিঢ়ে ভূজাং জবীষ্টং

শাষামিত্রং দুধবিতু যস্য ধর্মণ স্মারণি স্বপর্যন্তি পাতুরুধ। সাকেতুং বর্দ্ধয়ন্তি বিশ্বমাতা" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ অগ্নি-অগ্ গমন করা, যে এই শরীরের ঊর্দ্ধে গমন করে অর্থাৎ শ্বাস মিঢ়ে, ক্রিয়া করা, ভুজ্—ভোজন করা অর্থাৎ শ্বাসকে ক্রিয়া করিয়া ভোজন করিয়াছেন, জবীণ্টং (জীবন্—বেগবান) যিনি স্থিতিপদে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় শীঘ্র যান, শাষা—তালু হইতে মূর্দ্ধায় সদা থাকিয়া মিত্রং—সূর্যের মত জ্যোতির স্বপ্রকাশ হয়। দুধবিতু—এইরূপ করিতে করিতে অনেক দুঃখে অর্থাৎ ক্লেশে, ধবিতু—ধনুকের ন্যায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় টান থাকে এইরূপ যিনি ধর্ম কর্ম করেন তিনি স্বরেণি অর্থাৎ শরীর স্বরূপ পত্নী সূর্যের অর্থাৎ উত্তম-পুরুষের সহিত সদা আনন্দে থাকেন এবং আপনা আপনি রোধকে পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় (কর্মের অতীত অবস্থায়) স্থিতিপদকে পায়। সাকেতু—কিত্—বাস করা, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা যেখানে আলোও নাই অন্ধকারও নাই সেখানে বাস করিলে বিশ্ব সংসারের প্রকাশকে বাড়ায় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে হঠাৎ সমুদয় দেখিতে পায়। ভৃগবল্লী উপনিষদ বলিতেছেন - "প্রাণাপ্রাণয়ো কর্মেতি যশ্চ অয়ং পুরুষে যশ্চা সবো আদিত্যে।" প্রাণ ও অপানের কর্ম এই ক্রিয়া, এই ক্রিয়াতেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই কর্ম হইলে আব সব অকর্ম। যদি তাহাই হয় তবে দেখা যায় লোকে অকর্ম করে কিন্তু ফল চায় কর্মের। এই পুরুষে কুটস্থ ব্রহ্মরূপ যে সূর্য্য দেখা যায় তাহাতে ত্রিভুবন দর্শন হয়।

নাভিক্রিয়া সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন "অমৃতস্য নাভি ধ্রুবে

সদসি সীদতি"। (ঋগ) অর্থাৎ নাভি দৃষ্টিতে অমরপদ পাওয়া যায়, নিশ্চয় করিয়া জানিও সেই ব্রহ্মের সৎ পদ।

প্রাণ অপান উদান ব্যান ও সমান এ সকলের যে বায়ুক্রিয়া (প্রাণায়াম) তাহা ব্যতীত প্রাণ তত্ত্বান্তর।

"ইদমাদিত্য উত বিশ্বেচ দেবা উত্তরশ্মিং জ্যোতিষি ধারয়ন্ত। অস্যা দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরস্তু সূর্য্যো অগ্নিরুতরা হিরণ্যং"। (অথর্ব্ব) অর্থাৎ ইদমাদিত্য—এই কূটস্থ স্বরূপ আদিত্য, উত—বোনা, ক্রিয়া করাতে ইহারি মধ্যে বিশ্বসংসারের দেবতা আছে, উত্ত—আর্দ্র, মগ্ন হইয়া চন্দ্রের রশ্মিস্বরূপ ব্রহ্মপদ পাইয়া—জ্যোতিষি, ধারয়ন্ত সকল জ্যোতির যে কর্ত্তা ব্রহ্ম তাহাকে ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিয়া, অস্য দেবাঃ—ইহার দেবতা সকল, প্রদিশি—দুই দিকের মধ্যে আছেন। সূর্য্যস্বরূপ, অগ্নিস্বরূপ—যোনিমুদ্রায় কূটস্থে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে চারিদিকে অগ্নিস্বরূপ দেখা যায় এবং ওঁকার ধ্বনিস্বরূপ এক শব্দ হয় (রুতরা) হিরণ্যং—হিরণ্যস্বরূপ হইতেছেন।

"সর্ব্বমোঙ্কারং এবেদ গুঁ সর্ব্বং গায়ত্রী গায়তি চ ত্রায়তে চ"। (ছান্দোগ্য) অর্থাৎ এই শরীরই ওঁকার ইহা জানিলে সমস্ত জানা হইল। ক্রিয়াই গায়ত্রী, ক্রিয়া করিলেই ত্রাণ পায়।

"প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্বমিদং বশে যো ভূতো সর্ব্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং। নমস্তে প্রাণক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে। বিদ্যুতে বর্ষতে ঔষধি যৎ প্রাণ ঋতাবাসতে অভিক্রন্দব্যোষধে প্রাণো মৃত্যু প্রাণং দেবা উপাসতে প্রাণোহি সত্যবাদিন সূত্তম লোক আদধৎ। প্রাণো বিরাট, প্রাণো দেষ্টৃ প্রাণং সর্ব্ব উপা-

সতে প্রাণোহ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা প্রাণমাহ প্রজাপতিং প্রাণাপানৌ ব্রীহি যাবানত্বান প্রাণ উচ্যতে, যাবং প্রাণ আহিতা অপানো ব্রীহিরু-চ্যতে, অপানতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা যদাত্বং প্রাণ জিন্বস্যথ সজায়তে পুনং প্রাণমাহ মাতরীশ্বনাং বাতোহ প্রাণ উচ্যতে। প্রাণোহ ভূতং ভবঞ্চ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। প্রাণ মাসৎ পর্য্যাবৃতো নমদন্যো ভবিষ্যসি। অপাং গর্ভমিব জীবসে প্রাণবধ্নামিত্বাময়ী"। (অথর্ব)

অর্থাৎ এই প্রাণবায়ু যিনি হৃদয়ে আছেন তাঁহাকে নমস্কার অর্থাৎ তাঁহাকে তাঁহারই দ্বারা ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা নমস্কার। প্রাণের বশে সমুদয়, তিনি না থাকিলে কিছু নাই। প্রাণের দ্বারা বাহির ভিতর সমুদয় কর্ম হয়। প্রাণ যিনি সর্বের কর্ত্তা তাঁহার সেবা করা আবশ্যক অর্থাৎ ক্রিয়া করা আবশ্যক। যত কিছু হইয়াছে সকলেরই ঈশ্বর প্রাণ। এই প্রাণেশ্বরকে সেবা করার জন্য প্রাণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই প্রাণের বৃদ্ধির নাম প্রাণায়াম। অতএব সকল বুদ্ধিমানের উচিত প্রতিদিন প্রাণের সেবা করা অর্থাৎ ক্রিয়া করা। প্রাণেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এবং এই শরীর তাহার আধার। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সকলেরই ক্রিয়া করা উচিত যাহা মহান অমোঘ ঔষধ। সেই এক হইবার নিমিত্ত সকল শাস্ত্র এবং সকলের প্রথমেই প্রাণায়াম। সেই প্রাণ বায়ুর বিকারে মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্যুতি নাই আবার কূটস্থের শক্তি দ্বারা প্রকাশ হয়। তিনিই তেজ অপ্ অন্নস্বরূপা গায়ত্রী যাহার প্রকাশে ভিতর বাহির প্রকাশ হয়। ঈশ্বরকে মনে করা তাহাও প্রাণের কর্ম্ম। এই প্রাণের রোধে বিরাট মূর্ত্তি দেখায়, আর দেখিবার কর্ত্তা সেই প্রাণ। প্রাণকেই

সকলে উপাসনা করিতেছেন, কেহ মনোযোগপূর্ব্বক কেহ অমনোযোগপূর্ব্বক। এই প্রাণের দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র দেখা যায়। প্রাণাপানের মধ্যে পুরুষ, সেই প্রাণই আসিতেছেন ও যাইতেছেন, সেই প্রাণের নাম মাতরীশ্বা। এই প্রাণবায়ু দ্বারা সমস্ত হইয়াছে ও হইবে, প্রাণেই সব প্রতিষ্ঠিত। প্রাণক্রিয়া ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা, কারণ সত্যতে না থাকায় সবই মিথ্যা। অতএব আত্মক্রিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের মত, তাহা করা কর্ত্তব্য।

ক্রিয়া করিবার দেশ কালের কোন নিয়ম আছে? বেদান্ত বলিতেছেন "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" অর্থাৎ ক্রিয়া করিবার দিক দেশ কালের কোন নিয়ম নাই, যাহার যে সময়ে বা যখন মন সুস্থ থাকে তখনই ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। একই সময়ে যে ক্রিয়া করিতে হইবে তাহার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, তবে প্রথম প্রথম নিয়ম করিয়া করিলে চিত্তের প্রসাদ হয়। ক্রিয়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়াও উচিত। কোমর, হৃদয় ও কণ্ঠ তিন স্থান উন্নত করিয়া সমান বায়ুর প্রবাহে ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। "দ্বেতে চক্রে সূর্য্য ব্রহ্মাণি ঋতুথাবিদুঃ অথৈকং চক্রং যদ্ গুহাতদদ্বতয় ইদ্বিদুঃ" (ঋক্)। অর্থাৎ কুটস্থ মধ্যে দ্বিচক্র আছে, তিনিই সূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম। আত্মাকে স্মরণ করিয়া গমনাগমন করা অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে নক্ষত্রের মত এক চক্র তাহাতে যে গুহা দেখা যায় তাহাতে মহাজনেরা যান। তাহার পর বৃহৎ কুটস্থ, তাহার মধ্যে উত্তমপুরুষ বিরাজমান, যাঁহাকে সিদ্ধগণেরা এক দৃষ্টিতে দেখেন। তিনিই ব্রহ্মপুরুষ সকল দেবতার আরাধ্য। তাঁহাকে মরিবার সময় স্মরণ করিলেও মুক্তি হয়।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং
যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

শ্রীভগবান বলেছেন পত্র, পুষ্প, ফল ও জল এই চারটে জিনিস যে ভক্ত প্রযত্নসহকারে প্রদান করেন আমি তা গ্রহণ করি।

শ্রীভগবান তুলসীপাতা অথবা বেলপাতা এরকম কোন বিশেষ পাতা দিতে বলেননি। কেবল একটি গাছের পাতা দিতে বলেছেন। তুলসীপাতা বা বেলপাতা এগুলি মানুষের তৈরী সিদ্ধান্ত। মানুষের সিদ্ধান্ত কখনও সঠিক হতে পারে না। গীতার মাধ্যমে শ্রীভগবানের বাণীকেই তুলে ধরা হয়েছে, কারণ শ্রীভগবানের বাণী মানুষের কল্যাণ করতে পারে। এটা কিসের পাতা—আমপাতা, এটা কিসের পাতা—জামপাতা ইত্যাদি। এভাবে একটি পাতা একটি গাছের পরিচয়। তাহলে একটি পাতা দেওয়া মানে একটি গাছকে দিয়ে দেওয়া। তাহলে কি ভগবান একটা পুরো গাছ তুলে দিতে বলেছেন? তাও সম্ভব নয়। তাহলে সে গাছ কি? এই গাছের পরিচয় ঐ গীতার মধ্যেই দেওয়া আছে। "উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"। এমন একটি গাছ যার মূল ওপর দিকে এবং শাখা-প্রশাখা নীচের দিকে। গাছটি অশ্বত্থ অর্থাৎ অস্থায়ী, কিন্তু প্রাহুরব্যয়ম্ অর্থাৎ যার আদি ও অন্তে অব্যয়ম্ অর্থাৎ অবিনাশী। এ জগতে এমন কোন গাছ দেখা যায় না যার

মূল ওপরে এবং শাখাপ্রশাখা নীচে। বরং সকল গাছের মূল নীচের দিকে এবং ডালপালা ওপর দিকে এই গাছই দেখা যায়। তাহলে কি ভগবান ভুল বলেছেন? তা হতে পারে না। এই মানব শরীরই হল সেই গাছ, যার মূল ওপরে এবং শাখাপ্রশাখা নীচে। মূল অর্থে আদি বা উৎপত্তিস্থল। প্রাণের দুটি অবস্থা —স্থির ও চঞ্চল। স্থিরত্ব থেকেই চঞ্চলতার উৎপত্তি হয়। অতএব স্থিরত্বই মূল। এই মানবশরীরে কূটস্থের ওপরে প্রাণের স্থির অবস্থা এবং নীচের দিকে চঞ্চল অবস্থা। এই স্থিরাবস্থার সন্ধান কেবল যোগীরাই জানেন, অপরের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নীচের দিকে ক্রমান্বয়ে এই চঞ্চল অবস্থা হতেই উৎপন্ন হয় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য চিন্তা ভাবনা কল্পনা মন ইত্যাদি শত সহস্র শাখাপ্রশাখা। এই শাখাপ্রশাখাতেই মানুষ অবস্থান করে এবং এগুলিকেই আপন বলে মনে করে। এরা যেদিকে চালায় সকলে সেদিকেই চলে তাই মানবশরীরের ওপর দিকে স্থিরস্বরূপ মূল এবং নীচে চঞ্চল। এই শরীরকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শরীররূপ বৃক্ষ অশ্বত্থ অর্থাৎ অস্থায়ী; এই আছে, এই নেই, তথাপি এই শরীর লাভের পূর্বে অব্যয়, শরীর লাভের পর একে যে বাঁচিয়ে রেখেছে সে অবস্থাটাও অব্যয় এবং শরীর ত্যাগের পর যে অবস্থা তাও অব্যয় অর্থাৎ প্রাণ। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাটা বিনাশী কিন্তু স্থির অবস্থাটা অবিনাশী। এই তিন অবস্থাতেই স্থিরত্ব বর্তমান, স্থির না থাকলে চঞ্চলতার কোন অস্তিত্বও থাকে না। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে গীতা পরিষ্কার বলেছেন—"অব্যক্তা-দীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।" যার আদি এবং অন্তে অব্যক্ত

এবং মধ্যে ব্যক্ত। জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে প্রাণ এত সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করে যে ব্যক্ত হয় না অর্থাৎ প্রকাশ হয় না। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতক্ষণ শরীর থাকে ততক্ষণ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশমান। তথাপি এই প্রকাশমান দেহের মধ্যেও সেই স্থির অব্যক্ত অবস্থা থাকে, আর থাকে বলেই চঞ্চল অবস্থা বজায় থাকে এবং সকলে বেঁচে থাকে। অতএব সর্ব্বাবস্থাতেই মূলে স্থির অবশ্যই থাকে। তাহলে একটা পাতা দেওয়া অর্থে পুরো-পুরি দেহবোধকে দিয়ে দেওয়া। সাধন করতে করতে দেহাতীত অবস্থায় পৌঁছে গেলে যখন আর দেহবোধ থাকে না, সেটাই হল একটা পাতা শ্রীভগবানের চরণে দিয়ে দেওয়া। আমরা সাধারণ মানুষ এতই বুদ্ধিমান যে শ্রীভগবানের বক্তব্যের আসল রহস্যকে না জেনে পণ্ডিতদের কথা শুনে তুলসীপাতা, বেলপাতা ইত্যাদি গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে শ্রীভগবানের পায়ে অর্পণ করি।

এইভাবে পাতা দেওয়ার পর এবার দিতে হবে ফুল। ফুল হল সুন্দরের প্রতীক। কোন্ ফুল দিতে হবে তাও বলা হয়নি। অথচ আমরা পণ্ডিতদের কথা শুনে কালীর পায়ে জবাফুল, শিবের পায়ে ধুতুরাফুল ইত্যাদি দিয়ে থাকি। আসল কথা হল আত্ম-সাধন করতে করতে অনন্ত প্রভাসম্পন্ন আত্মজ্যোতি দর্শনে যোগী তন্ময় হন। সেই জ্যোতিই হল চির সুন্দর। এই সুন্দর অবস্থাকেও দিয়ে দিতে হবে, তখন আর কোন প্রকার দর্শন নেই, শ্রবণ নেই, কিছুই নেই। এর আগে দেহবোধ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তথাপি ভেতরে ভেতরে যা কিছু আত্মদর্শন হচ্ছিল এখন তাও দিয়ে দেওয়া হল।

এবার দিতে হবে ফল। পণ্ডিতদের কথামত আম জাম বেল বা কোন উৎকৃষ্ট ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে শ্রীভগবানের পায়ে দিতে লাগলাম। এতে কিছুই হবে না, আসল জিনিস দিতে হবে সেকথাই ভগবান বলেছেন। দীর্ঘ এবং কঠোর সাধন করে যাকিছু সাধনার ফল লাভ হয়েছে এবার তাও দিয়ে দিতে হবে। আমার অনেক যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়েছে আমি ভগবানকে দেখেছি, আমি কৃষ্ণ, কালী, শিব ইত্যাদি দেখেছি, আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছি ইত্যাদি যেসব জ্ঞান এবার তাও দিয়ে দিতে হবে। আমি বা আমার বলতে যেন কিছুই না থাকে। যতক্ষণ আমি ও ভগবান এই দুই বোধ আছে ততক্ষণ দ্বৈত। এই দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল। কারণ দুই থাকলেই দেখা ও না দেখা, জানা ও না জানা ইত্যাদি বোধ থাকে। দেখার মালিক মন। ভগবানকে দেখছি তার মানে এখনও আমার মন বেঁচে আছে, অতএব এখনও আমি মনাতীত হতে পারিনি, মন্মনা হতে পারিনি। এই মনও ইন্দ্রিয়, অতএব এখনও পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াতীত হতে পারিনি। ভগবানের রূপ দেখা, সেটাও মন দেখে। এবার আমাকে যেতে হবে সব-কিছুর অতীত অবস্থায়, জ্ঞানাতীত নিরঞ্জনং অবস্থায়। এইভাবে যখন সাধনার সকল ফল যাকিছু অর্জন করেছিলাম তাও দিয়ে দিতে পারলাম তখন আমি নিঃস্ব, নিস্পৃহ, নিষ্পন্দ হয়ে গেলাম, একা হয়ে গেলাম আর আমার কিছু নেই, আমিও নেই, সব শেষ।

এবার আমি নিশ্চল ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এখন আমাকে দিতে হবে তোয়ং অর্থাৎ জল। গঙ্গাজল কি নদীর জল তাও বলা হয়নি। কেবল জল দিতে হবে একথাই বলা হয়েছে। আমরা

পণ্ডিতদের কথামত গঙ্গাজল দিতে শুরু করলাম তাই আমাদের কিছুই হচ্ছে না। জল হল নিরাকার, যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের রূপ ধারণ করে জলের নিজের কোন রূপ নেই তাই জল হল নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক। এ অবস্থায় যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আমি ব্রহ্মজ্ঞ এ অবস্থাটাও দ্বৈত, তাই গীতা বলেছেন— এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থাটাও দিয়ে দাও।. তাহলে তখন তুমি নিশ্চল নির্গুণ নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে মিশে গিয়ে তুমি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাবে। যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে পেঁছে গিয়ে নিজেই নিজে হয়ে যাবে। তখন তোমার সব শেষ হবে। এতদিন নিজের মধ্যে নিজে না থাকায় জগৎ দেখছিলে, এখন নিজেই নিজেতে ফিরে গিয়ে নিজেই হয়ে গেলে। তখন তুমি ব্রহ্মজ্ঞও নও, জ্ঞানীও নও, তখন তুমি নিজেই ব্রহ্ম। এই নিশ্চল ব্রহ্মটাই তুমি, এটাই তোমার নিজ স্বরূপ। এই নিশ্চল ব্রহ্ম থেকে বা নিজ স্বরূপ থেকে চঞ্চলতার দরুণ বিচ্যুত হয়ে জীবরূপে অবস্থান করছিলে! এখন নিশ্চল অবস্থায় ফিরে এসে স্ব-স্বরূপে মিশে গেলে, এখন তুমিই অনন্ত, তুমিই বিশ্বরূপ, তুমিই জগন্নাথ।

এতক্ষণে আমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি যে পত্র পুষ্প ফল ও জল এই চারটে জিনিস দিয়ে দিলে যোগীর আর কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা তা না করে বাহ্য উপায় অবলম্বন করে বাহ্যিক চারটে বস্তু প্রদান করি তাই আমাদের কারো আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে না। ফলে আমরা জন্মমৃত্যুর ফাঁদে পড়ে দুঃখ-কষ্টে হাবুডুবু খাচ্ছি। গীতা আমাদের সঠিক কথাই বলেছেন, আমরা তার সঠিক অর্থ বুঝতে পারিনি।

সদ্‌গুরু

যোগীর দেশ ভারতবর্ষ। যোগ না জানলে যেমন যোগীকে জানা যায় না, তেমনি যোগীকে না জানলে অধ্যাত্ম ভারতকে জানা যায় না। তাই বলা হয় যোগ ছাড়া ভারত নেই, ভারত ছাড়া যোগ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানকালে এই সনাতন যোগের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অপপ্রচার শোনা যায়। বর্তমানে বলা হয় কলিযুগে যোগ চলে না। কেন কলিকালের মানুষ যোগ করতে পারবে না? কলিকালের মানুষ কি মানুষ নয়? পুরাকালে মানুষ যেভাবে জন্মাত, বেঁচে থাকত, মরত, এখনকার মানুষেরও কি তাই হয় না? তখনকার মানুষেরও সুখ-দুঃখ ছিল, সংসার ছিল, সবই ছিল এখনও তাই আছে। পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য কেবল একটা বিষয়েই দেখা যায়। সেটা হোলো পুরাকালের মানুষ প্রায় সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল; যোগসাধন করত, তাদের জীবন ছিল সাধারণ। তখনকার মানুষ যদি কেউ ঈশ্বর সাধন না করত তবে তাকে নিন্দা করা হোত। কিন্তু বর্তমানকালে এর বিপরীত দেখা যায়। এখনকার মানুষ বেশীরভাগই বিলাসপ্রিয়, আরামপ্রিয়, অল্পে সন্তুষ্ট নয় এবং ঈশ্বরমুখী মনোভাবের বড়ই অভাব। এখন যদি কোনো মানুষ ঈশ্বর সাধন না করে তবে সে নিন্দিত হয় না, বরং সাধনপরায়ণহীন ও বিত্তশালী মানুষই বর্তমান সমাজে অধিক

বন্দিত। বর্তমানে অধিক মানুষই যখন ঈশ্বরপরায়ণহীন তখন তাদের মধ্যে ঈশ্বরভক্তি থাকা সম্ভব নয়। অথচ ঐ মানুষগুলোকে যদি ভক্তিপথের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় তবে তাদের পক্ষে কি ভক্তি পথে ঈশ্বরসাধন করা সম্ভব ? যে জিনিস তাদের মধ্যে নেই সেই পথে জোর করে ঠেলে দিলে বরং অনর্থ সৃষ্টি করে। ভক্তি নিশ্চয়ই চাই, বিনা ভক্তিতে ঈশ্বর সাধন সম্ভব নয়। তাহলে এ ভক্তি তাদের অর্জন করতে হবে। যোগপথ কেমন করে সেই ভক্তিকে অর্জন করা যায় প্রথমে সেই শিক্ষাই দেয় এবং পরে যখন ভক্তি অর্জন হবে তখন তার পক্ষে ঈশ্বরসাধন সহজ হবে। তাই যোগীর চেয়ে বড় ভক্ত কোথায় ? যোগীকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হয়। যারা অজ্ঞ, যাদের আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই তারাই কেবল যোগপথ ও ভক্তিপথকে আলাদা মনে করে। তারা জানে না যে, যোগকর্ম ছাড়া সঠিক ভক্তিলাভ সম্ভব নয়। তাই যোগকর্ম হোলো আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। যিনি যোগী নন তিনি যদি যোগমার্গের বিরুদ্ধে কথা বলেন তবে তা ন্যায়সঙ্গত হয় না, কারণ যোগ সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তাঁর নিজের জ্ঞান নেই অথচ বিজ্ঞের মত কথা বলেন তবে তাঁর দ্বারা সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষকে প্ররোচিত করা যায় মাত্র, কিন্তু তাঁর দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। যোগপথের মূল কর্মই হোলো শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ে। এই শ্বাস-প্রশ্বাস কার নেই ? সকল জীবদেহে যখন এই শ্বাস-প্রশ্বাসই একমাত্র অবলম্বন, তখন সেই অবলম্বনকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরসাধন কি প্রকারে সম্ভব ? এই শ্বাস-প্রশ্বাস আছে বলেই জীবদেহে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ

ইত্যাদি যেগুলি সাধন পথের অন্তরায় সেগুলি বর্তমান থাকে এবং মন আপনা হতেই বহির্মুখী হয়। সেই বহির্মুখী মনে সঠিক ঈশ্বরভক্তি কি করে সম্ভব? তাই মনকে অন্তর্মুখী করে ভক্তি-লাভের উপায় হোলো যোগ। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ থেকে বিযুক্ত নয়, তেমনি জীবাত্মাও পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত নয়। অতএব সকল জীবই পরমাত্মার সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত। প্রাণের চঞ্চলতার জন্য আপাতত বিযুক্ত মনে হয়। এ কারণে সকলেই যোগী, তবে কেউ জেনে যোগী কেউ অজ্ঞতাবশতঃ না জেনে যোগী।

এই প্রকার আত্মজ্ঞানী যোগীই হলেন সদ্গুরু। আবার সাধারণ কথায় বলা যায়—"ঘুমালে যে জেগে রয়, সে তোমার গুরু হয়, তাঁরে ভজ হইয়া অনন্য" শাস্ত্র বলেছে—আত্মা হ বৈ গুরুরেকঃ।" আত্মাই গুরু। গু শব্দে অন্ধকার এবং রু শব্দে আলো। যিনি অন্ধকার হতে আলোকে পৌঁছে দেন তিনিই গুরু। তিনি আলো দান করেন অর্থাৎ জ্ঞান দান করেন। জ্ঞান কি তিনি বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেন? নিশ্চয়ই তা নয়। জ্ঞান সকলের ভিতরেই আছে। উহাকে কোন প্রকার ঘর্ষণের দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। সেই ঘর্ষণ ক্রিয়াই হল যোগকর্ম। যেমন চকমকির ভেতরে আগুন আছে সত্য কিন্তু ঘর্ষণের দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। বাহিরের আচার্য্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। তিনি সেই ঘর্ষণের প্রক্রিয়াটি দেখিয়ে দেন। সাধক সেই প্রকার ঘর্ষণকার্য্য করতে থাকলে তার ভেতর যে অনন্ত জ্ঞান আছে তার প্রকাশ হয় অর্থাৎ ভেতরের আচার্য্যই তখন সবকিছু বুঝিয়ে দেন। তিনি (আত্মা) না বুঝালে কারও সাধ্য নেই কিছু বুঝাবার। অতএব আত্মাই

প্রকৃত গুরু। গুরু-শিষ্যে পার্থক্য কি? কেবল জ্ঞানে পার্থক্য। সদ্‌গুরু যিনি তিনি পূর্ণজ্ঞানী, তাঁর অজ্ঞানের দিকের পাল্লায় কোন ওজন নেই। শিষ্যের অজ্ঞানের দিকেই পাল্লা ভারী। জ্ঞান ও অজ্ঞান—পাল্লার এই দুই দিক, যেদিকে বেশী হবে সেদিকেই পাল্লা ভারী হবে। সদ্‌গুরু যা দেখিয়ে দেন সেই যোগকর্ম যতই করবে ততই পাল্লার অজ্ঞানের দিকে ওজন কমবে ও জ্ঞানের দিকে পাল্লা ভারী হবে এবং কালে এমন হবে যখন অজ্ঞানের দিকে কোন ওজন থাকবে না। সে যা কিছু চায় সবই তার ভেতরে আছে; তাকে সদ্‌গুরু প্রদত্ত যোগকর্ম দ্বারা নিয়মিতভাবে ঘর্ষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে জাগাতে হবে, তাহলেই অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ হবে। গুরু প্রণামে আছে—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকাররূপী চরাচরে ব্যাপ্ত সেই আত্মজ্যোতিরূপ কুটস্থ পদকে যিনি দর্শন করিয়ে দেন তিনিই সদ্‌গুরু, সেই সদ্‌গুরুকে নমস্কার। কেবল কানে মন্ত্র দিলেই গুরু হয় না। সাধক প্রথম অবস্থায় দেহসর্বস্ব, জগৎ-সংসার তার সামনে বর্তমান, অতএব রূপের মধ্যেই তার বর্তমান অস্তিত্ব। সেই রূপের দর্শনই তিনি করিয়ে দেন, অবশ্য এজন্য সাধককেও উপযুক্ত হতে হবে। রূপাতীতের কোন প্রকার অনুভব করান সম্ভব নয় এবং সাধকের পক্ষে প্রথমাবস্থায় তা বোধগম্যও নয়। কিন্তু যোগকর্মের এমন মহিমা যেকোন সাধককে গুণাতীত ও রূপাতীত অবস্থায় পেঁছে

দেয়। যতক্ষণ রূপ আছে ততক্ষণ দুই আছে। রূপাতীত অবস্থায় সবই এক, তখন কে কাকে দেখবে বা দেখাবে? তখন গুরু, শিষ্য ও ভগবান এক হয়ে যান। এটাই সকলের উৎসস্থল। সেই উৎসস্থলে পেঁছিলে বা বিলীন হলে তবেই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

আজন্মকোট্যাং দেবেশি জপব্রততপঃক্রিয়াঃ।
অস্যাঃ সর্বফলং দেবি! গুরুসন্তোষমাত্রতঃ॥

কোটি জন্ম জপ ব্রত তপস্যাদি সৎক্রিয়া করায় যেরূপ কর্মক্ষয় হয়ে জীব মুক্তিপথে আসতে পারে, যোগকর্ম (আত্মকর্ম) দ্বারা অচিরে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ামাত্রই সেই ফললাভ হয়। কারণ আত্মাই প্রকৃত গুরু এবং আত্মকর্মই প্রকৃত গুরুসন্তোষ বা গুরুসেবা। এই গুরুসেবা সকলের করা উচিত।

বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যশ্চ যে নরাঃ।
গুরোঃ সেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

বৃথা বিদ্যা এবং ধনাভিমানে যারা মন্দভাগ্য কেবল তারাই আত্মক্রিয়ায় অর্থাৎ গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, তা সত্যই বলছি। বিদ্যার গৌরবে, সামান্যতম প্রাকৃতিক জ্ঞান গৌরবে লোকে মত্ত হয়ে কুতর্কের বশবর্তী হয়ে জ্ঞানালোকের দ্বার উদ্ঘাটনে পরাঙ্মুখ থাকে।

গুরোঃ সেবা পরমং তীর্থমন্যত্তীর্থমনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্॥

আত্মকর্মই (যোগকর্মই) পরম তীর্থ এবং আত্মকর্মজনিত সহস্রার বিগলিত অমৃতধারাই সর্বতীর্থাশ্রয়স্বরূপ। আত্মকর্মই গুরুসেবা, এই গুরুসেবা করতে পারলে সহস্রার হতে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হয় তাই সকল তীর্থের ফলস্বরূপ। উহাই প্রকৃত চরণামৃত বা প্রসাদ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে শান্তি। অপরাপর বাহ্যিক তীর্থাদি সমস্ত অনর্থের হেতু, কারণ তাতে অধিকতর কর্ম সঞ্চয়েরই সম্ভাবনা। যিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করে এই সহস্রার-বিগলিত অমৃত পান না করেন তাঁর মানব জীবনই বৃথা।

সেই সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? "গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।" তিনি গগন সদৃশ, গগন অর্থাৎ শূন্য। "শূন্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।" প্রাণ শূন্যস্বরূপ। অতএব যিনি শূন্য, তিনিই প্রাণ। তিনিই সদ্‌গুরু।

মা অন্নপূর্ণা

যিনি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, প্রসব করে, স্তনপান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন তিনি হলেন মা। শুধু তাই নয় সেই সন্তানকে মা সদা-সর্বদা স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে লালন-পালন করেন, কখনও চোখের আড়াল হতে দেন না, সর্বদা কাছে থাকেন। কি করলে সন্তান সুখে থাকবে তার জন্য মা সব সময় সচেষ্ট। এই স্নেহ-ভালবাসা মা ছাড়া আর কারও কাছে পাওয়া যায়না। তাই সন্তান

মা ছাড়া আর কাউকে এত কাছের মানুষ, আপনজন ভাবতে পারে না।

ঠিক তেমনি এই জগৎ-সংসারকে, প্রতিটি প্রাণীকে যিনি গর্ভে ধারণ করে, প্রসব করে, জল, বায়ু, খাদ্য দিয়ে, নিজের কোলে স্থান দিয়ে, স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে লালন-পালন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি হলেন সবার মা, জগৎজননী। তাই সন্তান যেমন নিজের মাকে ভুলতে পারে না তেমনি জগৎজননীকেও ভোলা সম্ভব নয়। এই জগৎজননীকে ছাড়া কারও পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। একারণে অবচেতন মনে যেমন নিজের মায়ের প্রতি আপনা হতে শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভক্তি গড়ে ওঠে তেমনি জগৎজননীর প্রতিও গড়ে উঠতে বাধ্য। তাই আমরা জগৎ প্রসবিনীকেও মা-রূপে ভাবি। এই মাকে আমরা বহুভাবে দেখবার চেষ্টা করি। আমার মা যেমন কখনও রান্না করছেন, কখনও সংসারের নানা কাজ করছেন, কখনও আমাকে স্নান করাচ্ছেন, দুধ খাওয়াচ্ছেন ইত্যাদি নানাভাবে নানারূপে ব্যস্ত, তেমনি জগৎজননীও নানারূপে ও নানাভাবে এই জগৎকে প্রতিপালন করছেন। তাই আমরা জগৎজননীকেও নানারূপে ও নানা ভাবে দেখি। কখনও তিনি কালী ও দুর্গারূপে সকলের অভ্যন্তর শত্রুদের নিধন করছেন, কখনও তিনি ধরিত্রী-রূপে সকলকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, কখনও তিনি জল, বায়ু ও অন্নরূপে আমাদের সকলকে প্রতিপালন করছেন। তখন মায়ের সেই রূপকে বলি "মা অন্নপূর্ণা"। কিন্তু এই বিরাট, মহান্ ও অনন্ত মা কে? তাঁকে আমরা জানবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করি। কখনও আমরা সেই বিরাট মহান্ মায়ের মূর্তি গড়ে পূজা করি, মা মা বলে ডাকি, আবার ধ্যানস্থ হয়ে তাঁর সন্ধান করি।

কিন্তু কিছুতেই তাঁকে পাওয়া যায় না ; এত কাছে থেকেও যেন অনেক দূরে, নাগালের বাইরে বলে মনে হয়। কেন এমন হয় ? আমি যখন মা বলে ডাকি তখনই আমার গর্ভধারিণী কাছে আসেন কিন্তু জগৎজননী কেন আসেন না ? তাহলে আমাদের প্রথমে বোঝা দরকার যে এই জগৎজননী কে ? অন্নপূর্ণা কে ? তিনি হলেন চঞ্চল প্রাণ। প্রাণের দুটি অবস্থা—স্থির ও চঞ্চল। স্থির হলেন পুরুষ বা ব্রহ্ম। প্রাণের এই স্থির অবস্থায় কিছুই উৎপন্ন হয় না। এই স্থির অবস্থা যখন চঞ্চল হয় সেই চঞ্চলতা থেকেই সব কিছুরই উৎপত্তি। স্থিরত্বই মূল হওয়ায় চঞ্চলতার মধ্যেও সেই স্থিরত্বই বর্তমান থাকে, তাই স্থিরত্বই সকল সৃষ্টির মধ্যে বীজপ্রদ পিতা। আর প্রাণের ঐ চঞ্চল অবস্থা হতে যেহেতু সব কিছুর উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সেহেতু চঞ্চলতাই গর্ভধারিণী, প্রসবকারিণী ও লালন-পালন কর্তৃরূপে জগৎজননী। তিনিই এই দেহ রচনা করে দেহের ভেতরে আছেন, দেহের সকল ক্ষুধারূপে তিনিই আছেন, অন্নরূপে তিনিই ক্ষুধার নিবৃত্তি করছেন। এই-ভাবে তিনি জগৎকে খাওয়াচ্ছেন, তাই তাঁর এই রূপটাকে বলা হয় অন্নপূর্ণা। আবার এই অন্নপূর্ণা শিবকেও ভিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁকেও খাওয়াচ্ছেন। শিব হলেন স্থির প্রাণ। স্থির প্রাণে কিছুই নেই, ক্ষুধাও নেই, অন্নও নেই। তথাপি শিবের ভেতরে ক্ষুধারূপে তিনি, আবার অন্নরূপেও তিনি। অর্থাৎ অন্নপূর্ণা বা চঞ্চল প্রাণ তাঁর চঞ্চলতাকে দান করলেন শিবকে অর্থাৎ স্থির প্রাণকে বা মূলকে। দান করে তিনি নিজেই স্থির হলেন। অতএব অন্নপূর্ণার পূজো বা আরাধনা বলতে চঞ্চল প্রাণের কর্মকে বোঝায়।

যে কর্ম করলে চঞ্চল প্রাণকে জানা যায়, থামান যায় তাই তাঁর পূজা বা আরাধনা। চঞ্চল প্রাণ এই দেহে আছেন বটে কিন্তু কেউই তাঁকে জানে না, কারণ তিনি 'শূন্যে ধাতুর্ভবেৎ প্রাণ'—তিনি শূন্যরূপে এই দেহে এবং সর্বত্র বিরাজিত হওয়ায় তাঁকে জানা যায় না। তাই বিজ্ঞান সম্মত যে সাধন প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই চঞ্চল প্রাণকে জানা যায় তাই সকলের করা উচিত। তবেই প্রকৃত অন্নপূর্ণা পূজা হবে এবং মনুষ্য জন্ম সফল হবে।

দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী

দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় পূজা। ঋষিরা এইভাবে সারা বছর ধরে নানা পূজার ব্যবস্থা করেছেন যাতে মানুষ অধ্যাত্মপথে আকর্ষিত হয়। এই সব পূজার মাধ্যমে মানুষ যাতে আত্মরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে তার নিখুঁত পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা জানতেন হঠাৎ কেউ মনুষ্য-জন্মলাভ করতে পারে না। দুর্গাপূজার মাধ্যমে ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি নিকৃষ্ট প্রাণী থেকে শুরু করে কাল বিবর্তনে মনুষ্য জন্ম লাভ করে তারপর আত্মসাধন শুরু করে কিভাবে শিবাবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় তারই এক নিখুঁত বৈজ্ঞানিক উপায় ঋষিরা দেখিয়েছেন। কিন্তু কালে মানুষ ঋষিদের সেই উচ্চ আদর্শকে ধরে রাখতে না পারায় বর্তমানের দুর্গোৎসবে পরিণত হয়েছে।

দুর্গাপূজার বদলে দুর্গোৎসব হওয়ায় সত্যকার পূজা যে কি তা আর রইল না। এখন কেবল আনন্দই সার হল।

এখন দেখা যাক দুর্গাপূজার মাধ্যমে ঋষিরা আত্মসাধনার কি পথ দেখিয়েছেন। ১০ হাত বিশিষ্ট মানুষ কোথাও দেখা যায় না, আবার একজন নারী কখনও প্রবল বলশালী পুরুষকে হারাতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলি অবাস্তব কল্পনা বলে মনে হয়। সাপ, ইঁদুর, পঁ্যাচা, ময়ূর, হাঁস, সিংহ, মহিষ ইত্যাদি বিভিন্ন নিকৃষ্ট জীবন ধীরে ধীরে অতিক্রম করে মানুষ হল। এই ধরণের মানুষের মধ্যে থাকে প্রবল হিংসা, ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি কারণ সে সবেমাত্র মনুষ্য জন্মে উন্নীত হওয়ায় অতীতের পশু-বৃত্তিগুলি দমিত করতে পারে নি। এরপর ধীরে ধীরে অনেক মনুষ্যজন্ম অতিক্রম করায় তার আত্মসাধনার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। তখনই তার ইচ্ছা জাগে এই সব পূজার অন্তর্নিহিত রহস্যকে জানার। তিনি তখন প্রকৃত দুর্গাপূজা করার অধিকারী হন, বাকি সকলের কাছে দুর্গোৎসবই থেকে যায়। তিনি তখন জানতে পারেন দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী। কে দুর্গতি নাশ করতে পারেন? ভয়ঙ্কর জটিল এবং ক্ষণভঙ্গুর এই শরীরই হল কেল্লা বা দুর্গ। এই শরীররূপে দুর্গের ভেতরে যিনি বাস করেন তিনি দুর্গা। এই শরীর হল দেহ, সেই দেহের মধ্যে যিনি অবস্থিত তিনি দেহী। সেই দেহীই হলেন দুর্গা যাকে প্রাণ বলা হয়। এই প্রাণ আছে বলে দেহ বেঁচে থাকে, কর্মক্ষম থাকে। এই প্রাণ যেমন দেহে আছেন দেহীরূপে তেমনি তিনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতে বর্ত্তমান, তাই বলা হয় সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ। সেই মূল প্রাণ

এক হওয়া সত্ত্বেও কার্যকারিতারূপে দশভাগে বিভক্ত হয়ে সব কর্ম করেন। সেই দশ প্রাণ হল প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রাণের দ্বারা সকল জীব সব কর্ম করে থাকে। তাই এই দশ প্রাণের প্রতীক হল দুর্গার দশ হাত, কারণ হাত হল কর্মের প্রতীক। আবার একে দশ ইন্দ্রিয়ও বলা যায়, কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষ সব কর্ম করে। এই দুর্গার পদতলে পশুরাজ সিংহ, তাকে তিনি দলন বা দমন করে রেখেছেন। এই সিংহ হল কামের প্রতীক। কামকে হত্যা করলে সৃষ্টি বজায় থাকে না তাই তাকে বশীভূত করে রেখেছেন। প্রাণ থেকেই কামসহ সকল ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, আবার সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কাম সবচেয়ে বলশালী তাই সে পশুরাজ। দুর্গা অসুরকে বধ করেছেন। অসুর হল ক্রোধের প্রতীক। সাধকের উচিত ক্রোধকে হত্যা করা। এই ক্রোধও প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়। পাশে লক্ষ্মীদেবী, তাঁর বাহন পেঁচা। সাধকের সাধনা করতে করতে যখন লক্ষ্মীলাভ অবস্থা হয় তখন তাঁকে সাবধান করা হচ্ছে যে যেন তাঁর তখন পেঁচার অবস্থা না আসে। পেঁচা দিবান্ধ এবং নিশাচর। ধনলাভ হলে সাধকের যেন পেঁচার অবস্থা না আসে তার জন্য এই সাবধানবাণী। অপর পাশে সরস্বতী, তাঁর বাহন হাঁস। হাঁসের কাজ নীর ও ক্ষীর একত্রে থাকলে তার থেকে ক্ষীরকে বেছে নেওয়া। সাধক যখন সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করেন তখন তাঁর সঠিক জ্ঞান হওয়ায় এই অবস্থা লাভ করেন। তিনি তখন মায়াময় মলিন এই জগৎ সংসারে থেকেও সারবস্তুকে বেছে নিতে পারেন। এই অবস্থাকেই পরমহংস অবস্থা বলে। কিন্তু সাধককে আরো অগ্রসর হতে হবে,

কারণ তখনও তাঁর অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠালাভ হয়নি। পাশে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিক। কার্ত্তিক হলেন বীরত্বের প্রতীক। সাধককে বীরত্বের সঙ্গে সাধনা বা যুদ্ধ করে আত্মরাজ্য স্থাপন করতে হবে। তাই তাঁর হাতে তীর ধনুক। তীর অর্থে শর, বাণ বা শ্বাসকে বোঝায় এবং ধনুক অর্থে এই দেহ। বীরত্বের সহিত শ্বাসের দ্বারায় অর্থাৎ বায়ুক্রিয়ার দ্বারা যিনি প্রাণকর্ম করেন তিনিই কার্ত্তিক, কারণ শ্বাস আছে বলেই জীব বেঁচে থাকে। সেই কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর। ময়ূর পুচ্ছে চোখের মত যা দেখা যায় তা কূটস্থ বা ত্রিনয়নের প্রতীক। সাধক বীরবিক্রমে সাধনা করতে থাকলে অবশ্যই এই ত্রিনয়ন দর্শন হবে যা সকল মানুষের শরীরে বর্তমান। এই ত্রিনয়নই সকল সাধনার পীঠস্থান। এত কষ্ট করে সাধক সাধনা করলেন, তাই তাঁর সিদ্ধি বা মুক্তি চাই অর্থাৎ বিজয়। সেজন্য সিদ্ধিদাতা গণেশ। তাঁর বাহন মূষিক। মূষিকের ধর্ম অকারণে অনিষ্ট করা। এই অবস্থায় পেঁছেও সাধক তখনও অদ্বৈতে সম্পূর্ণরূপে স্থিতিলাভ করতে পারেননি তাই তাঁকে তখনও অনিষ্টকারী হতে দূরে থাকতে হবে, তা না হলে সিদ্ধি বা মুক্তি তাঁর হবে না। এই অবস্থায় পেঁছে বেশীর-ভাগ সাধক ভাবেন—আমি বড় সাধক, আমার অনেক শিষ্য, আমি মঠ করব, মিশন করব, আমায় লোকে মান্য করুক ইত্যাদি অহং-বোধে চালিত হয়। এ সবই সত্ত্বগুণের ছলনা। যে সাধক সত্ত্বগুণের এইসব ছলনাকে অতিক্রম করতে পারেন তিনি তখন অদ্বৈতরূপী নিশ্চল ব্রহ্মে অর্থাৎ শিবাবস্থায় পেঁছে যান, তাই সবার উপরে আছেন শিব, তিনি ব্যোমতত্ত্ব। তিনি বিশ্বনাথ হওয়া

সত্ত্বেও তাঁর থাকবার কোন স্থান নেই। তিনি তখন শ্মশানবাসী। শ্মশান অর্থাৎ যেখানে কিছুই নেই, এই কিছুই নেই অবস্থাই ব্রহ্ম বা প্রাণের নিশ্চল অবস্থা। তাই শিবের বস্ত্র নেই, ভস্ম মেখে বসে আছেন অর্থাৎ সাধকের তখন সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ অবস্থা। সাধক তখন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠালাভ করায় আর নিজের বলতে কিছু থাকে না। শিবের হাতে ডমরু। ডমরুর দুদিক থেকে সমান শব্দ হয়। এই শব্দ ওঁকারধ্বনির প্রতীক। সাধক তখন ওঁকার ধ্বনিতে তন্ময় হয়ে একীভূত হয়। তার অপর হাতে ত্রিশূল, ত্রিশূল হল সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের প্রতীক। অর্থাৎ সাধকের তখন ত্রিগুণাতীত অবস্থা। শিবের কোমরে গলায় সাপ। সাপ হল হিংসার প্রতীক। সাধক তখন হিংসা সহ সকল ইন্দ্রিয়কে দমন করে অহিংস বা ইন্দ্রিয়-বিবর্জিত অবস্থা লাভ করেন। সেই শিবের বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম। বৃষের চারটি পা—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; ধর্মের চতুষ্পাদের প্রতীক। তাহলে দেখা গেল যে এই দুর্গাপূজার মাধ্যমে ঋষিরা নিকৃষ্টতম জন্ম হতে ক্রমান্বয়ে কাল-বিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত মানুষ শরীর লাভ করে তারপর আত্মসাধন করে কিভাবে শিবাবস্থায় বা শূন্যব্রহ্মে মিলে যাওয়া যায় অর্থাৎ দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে ফিরে যাওয়া যায় তার উপায় বলে দিয়েছেন। এই প্রকারে সমস্ত দেব-দেবীতত্ত্বকে জেনে অর্থাৎ এসবের মাধ্যমে ঋষিরা যে অন্তর্নিহিত সাধনার কথা বলেছেন সেইভাবে সাধনা করলে তবেই সিদ্ধি বা মুক্তি আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান-কালে মানুষ সেই উচ্চ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় তাদের দুর্গতিনাশ হচ্ছে না। মানুষ ভুলে গেছে যে প্রাণই দুর্গা, তিনিই

এই দেহরূপ কেল্লা বা দুর্গে বাস করে চঞ্চল গতি-প্রাপ্ত হয়ে দুর্গতি প্রদান করছেন, আবার সেই প্রাণকে সাধনার দ্বারা স্থির করতে পারলে দুর্গতি নাশ হয়। তাই ঋগ্বেদ বলেছেন—"যে অগ্নিবর্ণাং সৌখ্যাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজা তান্ তারয়তি দুর্গা নিনাবেব সিন্ধু দুরিতাত্যগ্নি।" অর্থাৎ সেই দ্বিজই শুভ এবং সুখলাভ করেন, অর্থাৎ সংসাররূপ সমুদ্র হতে পার পান যিনি প্রত্যহ ত্রিনয়নে অবস্থান করে সহস্র সূর্যসম তেজবর্ণা দেহরূপ এই কেল্লার অধিপতি প্রাণরূপা দুর্গার দর্শনলাভ করে স্থিরস্বরূপ শিবাবস্থায় মিলে যান।

সরস্বতী

আমরা সাধারণ মানুষ সরস্বতীর মূর্তি তৈরী করে পূজো করে থাকি। কিন্তু এই পূজোর মাধ্যমে ঋষিরা যে আত্মসাধনের কথা বলেছেন, যে সাধন করলে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে সেদিকে কারো দৃষ্টি নেই। এই আত্মসাধনার বা অন্তরসাধনার দিকে খেয়াল বা লক্ষ্য না থাকায় কারো সঠিক সরস্বতী পূজো বা জ্ঞানের আরাধনা করা হয় না, কেবল বাহ্যাড়ম্বরই সার হয়। অতএব বাহ্যপূজোর মাধ্যমে ঋষিরা যে অন্তর সাধনার কথা বলেছেন সেটা কি, তা সামান্য আলোচনা করা যাক। এই আত্মসাধনই যে

আসল এবং বাহ্যপূজো অধম সে কথা ঋষিরা পরিষ্কার বলেছেন -

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ।

স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বহিঃপূজো অধমাধমঃ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থান করা উত্তম, ধ্যান মধ্যম, স্তুতিজপ অধমভাব এবং বাহ্যপূজো বা স্থূল পূজো অতি অধম।

সরস্বতী হলেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁর আরাধনা করলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাঁর অপর নাম বাগ্‌দেবী, ভারতী, বীণাপাণি ইত্যাদি। বাগ্‌দেবী অর্থে যিনি বাকের দেবী। যিনি আছেন বলে মানুষ কথা বলতে পারে। এই শরীরে প্রাণ আছেন বলে মানুষ বেঁচে আছে এবং কথা বলতে পারে। তাই প্রাণই হলেন বাগ্‌দেবী। ভারতী অর্থে ভা=দীপ্ত অর্থাৎ আত্মজ্যোতি যা স্বয়ং প্রকাশ। যে সাধক সাধন করে নিজ দেহস্থ আত্মজ্যোতিতে সদাই রত বা অবস্থিত তিনিই ভারতী। ভারত শব্দের অর্থও তাই। বীণাপাণি অর্থে হাতে বীণা যাহার। হাত হল কর্মের প্রতীক আর বীণা হল একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র। এই মনুষ্য শরীরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি তন্ত্রী বা তার আছে। এই তিন তন্ত্রীই তিন গুণ। এরই মাধ্যমে মানুষ সব কর্ম করে থাকে এবং সমাহিত অবস্থায় এর ভেতর থেকে এক সুমধুর বাদ্যধ্বনি যোগীরা শুনে থাকেন। এ সবের মূল হল সেই চঞ্চল প্রাণ। প্রাণ আছেন বলেই তিন তন্ত্রী বা তিন গুণ সহ সারা শরীর কর্ম করে। তাই প্রাণই হলেন বীণাপাণি। সরস্বতী, স=বায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু। র=বহ্নিবীজ বা তেজস্তত্ব, স্ব=নিজে বা স্বয়ং, ত=

তরণ অর্থাৎ পার হওয়া, ঈ=ঈক্ষণ বা দর্শন, যে শক্তি চক্ষুতে আছে। অতএব সরস্বতী অর্থে প্রাণবায়ুর কর্ম তেজস্তত্ত্বের দ্বারায় (যা নাভিতে অবস্থিত) করতে করতে যখন চক্ষুতে অর্থাৎ কূটস্থে আত্মজ্যোতি দর্শন হয়, যাকে গীতায় সহস্রাংশু বা সহস্র সূর্য্যসম বলা হয়েছে, তখন নিজেকে জানা যায় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হওয়ায় ত্রাণ প্রায়। তখন আর এই ভবসংসারে আসতেও হয় না, যেতেও হয় না। এই অবস্থাকেই সরস্বতী বলে। এই সাধন করতে হলে প্রাণকেই প্রয়োজন। তাই প্রাণই হলেন সরস্বতী এবং সকল জ্ঞানের মূল মালিক।

এই সরস্বতীর বাহন হংস। দুধ ও জল মিশে থাকলে তার থেকে হাঁস যেমন দুধটুকু খেয়ে ফেলে এবং জল পড়ে থাকে, তেমনি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন সাধক এই জগৎ সংসারের মধ্যে যা কিছু মলিনতা তাকে বাদ দিয়ে একমাত্র আত্মজ্ঞানকেই জ্ঞান বলে জানেন। তাই তাঁকে তখন পরমহংস বলা হয়। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মলিনতা এবং স্থির অবস্থাই মূল বা আসল। প্রাণের ঐ অনন্ত চঞ্চলতাকে সাধনার দ্বারা থামিয়ে তিনি তখন স্থিরে অবস্থান করেন। প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতেই যত কিছু উৎপত্তি হয়, তাই প্রাণের চঞ্চল অবস্থাটাই মা পদবাচ্য। কিন্তু প্রাণের স্থিরাবস্থায় কোনকিছু উৎপন্ন হয় না অথচ সর্বকিছুর মূল বা আদি। তাই ঐ স্থিরাবস্থাই হল পিতা। যতকিছু জ্ঞান, জানাজানি সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় হয়ে থাকে, কিন্তু স্থিরাবস্থায় কিছুই না থাকায় 'শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ'। তখন কেবল 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে'। এই

সরস্বতী শ্বেতবর্ণা। সাদা কোন বর্ণ নয় অর্থাৎ আত্মার কোন বর্ণ নেই এবং আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

আমরা গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীতে স্নান করে পুণ্যলাভ করে থাকি। এই প্রকার স্নানের মাধ্যমে যে পুণ্যসঞ্চয় তা বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত। আপামর জনসাধারণ স্রোতস্বিনী নদীতে শরীরকে ডুবিয়ে এই প্রকার স্নান করতে পারে, এতে স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মনের উৎকর্ষ বা ভক্তি ভাব অবশ্যই হয় কিন্তু মনুষ্য জন্ম সফল হয় না। মনুষ্য জন্ম সফল করতে হলে অন্তর গঙ্গা যমুনা বা সরস্বতী নদীতে স্নান করা চাই। এই তিন নদী যে কি সে বিষয়ে ঋষিরা পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছেন—

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গল যমুনা নদী।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥
·· জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র।

অতএব অন্তর গঙ্গারূপী সুষুম্না নাড়িই হল সরস্বতী। প্রাণের অস্তিত্বেই সুষুম্নার অস্তিত্ব, তাই প্রাণই হলেন প্রকৃত সরস্বতী। এই প্রাণরূপী সরস্বতীর আরাধনা করা সকলের প্রয়োজন, তবেই সত্যকার আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় এবং ঋষিরা বাহ্যপূজার মাধ্যমে এই প্রাণের সাধনার কথাই সকল মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঋষিদের সেই শিক্ষার কথা ভুলে গিয়ে বর্তমান মানুষ কেবল বাহ্য পূজায় এবং বাহ্যচটকে আকৃষ্ট হওয়ায় সত্যকার জ্ঞান লাভ করতে পারছে না, তাই আজ সমাজে এত হানাহানি।

মা

যিনি তোমার আমার মা, তিনি সকলের মা। তিনি কেবল মানুষের মা নন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, ধূলিকণা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য সকলের মা। সবকিছু তিনি প্রসব করে আবার সবার ভেতরে তিনিই আছেন। আমরা সবাই মায়ের পেট থেকে জন্মাই, কিন্তু যে মায়ের পেট থেকে জন্মালাম সেই মাকেই যখন বুঝতে পারি না, তখন জগতের মাকে কেমন করে বুঝব! অতএব ক্ষুদ্র মাকে বাদ দিয়ে অনন্ত মাকে বুঝতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

আসলে মায়ের দেহ থেকে কি সন্তানের জন্ম হয়? তা হয় না। মায়ের দেহটা মা নয়, মায়ের ঐ দেহের ভেতরে যিনি আছেন, যাঁর বলে বলীয়ান হয়ে মা চলাফেরা করেন, জীবিত থাকেন, তিনি মা। তাঁকে বলা হয় প্রাণ বা আত্মা অর্থাৎ দেহের ভিতরে যিনি দেহী। সেই দেহী না থাকলেই মৃত। সেই প্রাণের ধারাটাই (Continuation) মা। তাহলে দেখা গেল প্রাণ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি হয়, দেহ থেকে নয়। এই প্রাণের দুটো দিক্ আছে, একটা চঞ্চল, অপরটা স্থির। স্থির দিকটাই মূল বা আদি, তাই স্থির দিকটাই পুরুষ বা ব্রহ্ম। এই দিকটা থেকে কোন কিছু উৎপত্তি হয় না, ইনি সদাই একরূপ তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—

'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে।' নিশ্চল অবস্হাকেই ব্রহ্ম বলে। এই স্হির দিকটার একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই শাস্ত্র বলেছেন—'একাংশেন স্হিতো জগৎ।'

তাহলে দেখা গেল মায়ের দেহেতে যে চঞ্চল প্রাণ সন্তানের দেহেতেও সেই চঞ্চল প্রাণ। এই ভাবেই জন্মদায়িনী মা সন্তানের ভেতর অবস্হান করেন। অতএব দেহস্হ চঞ্চল প্রাণরূপী মাকে জানলেই জগতের মাকে জানা যায়। জগতের সবকিছুর মধ্যেও সেই চঞ্চল প্রাণ বর্তমান। তাই নিজ দেহস্হ চঞ্চল প্রাণকে জানলেই মাকে জানা হ'ল এবং জগতের মাকেও জানা হ'ল। এই চঞ্চল প্রাণই ঈশ্বর, ভগবান, মা ও সর্বময় কর্তা; তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ। এই মাকে আমরা বলি দুর্গতিনাশিনী, কারণ তিনি আমাদের সকল প্রকার দুর্গতি নাশ করেন। দুর্গতি অর্থাৎ স্হির প্রাণরূপ ব্রহ্ম থেকে দূরে থাকলেই দুর্গতি। যদি আত্মসাধনার দ্বারা চঞ্চল প্রাণকে স্হির না করে চঞ্চল অবস্হাতেই থাকা হয়, তাহলেই দুর্গতি। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয় তেমনি চঞ্চল প্রাণকে ধরেই প্রাণকে স্হির করতে হবে এছাড়া কোন উপায় নেই।

আমরা দেখি এই দুর্গতিনাশিনীর দশটি হাত। দশ হাত-বিশিষ্ট মানুষ কোথাও দেখা যায় না। এই দশ হাত হ'ল দেহের ভেতর দশ ইন্দ্রিয় বা দশ প্রাণের প্রতীক। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং দশ প্রাণ হল দশ বায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। মোট ঊনপঞ্চাশ

বায়ুর মধ্যে এই দশ বায়ুই প্রধান। তাই আমরা যত প্রকার কর্ম করি সবই ঐ দশ ইন্দ্রিয় বা দশ প্রাণের দ্বারাই করে থাকি। তাই মায়ের দশ হাত হ'ল কর্মের প্রতীক। তাঁর বাহন হল সিংহ। সিংহ হল কামের প্রতীক। কামকে জয় করতে হবে, একেবারে মেরে ফেললে চলবে না, তাহলে সৃষ্টি নষ্ট হবে। তাই তিনি সিংহকে পায়ের দ্বারা দমন করে রেখেছেন। অর্থাৎ সাধক তার কামকে কেবলমাত্র সৃষ্টির জন্যই ব্যবহার করেন ভোগের জন্য নয়, এইভাবে বশীভূত রাখেন। তাঁর পায়ের তলায় অসুর। অসুর হল ক্রোধের প্রতীক। সাধকের ক্রোধকে বিনাশ করতে হবে, তাই অসুরকে বধ করেছেন। তাঁর পাশে কার্তিক। কার্তিক হল বীরের প্রতীক। সাধককে বীর হতে হবে অর্থাৎ বীরত্বের সহিত সাধন করতে হবে। পাশে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী হলেন ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। এইভাবে যিনি আত্মসাধন করেন তিনি অবশ্যই সকল ঐশ্বর্যের মালিক হন। কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেঁচা দিবান্ধ, অন্ধকারের জীব। এই অবস্থাপন্ন সাধক যদি সাবধান না থাকে তবে তাকে ঐশ্বর্যের প্রলোভন অনেক নীচে নামিয়ে দেয়, সাধনার পতন হয়, অতএব সাধক সাবধান। অপর পাশে সরস্বতী। সরস্বতী হলেন জ্ঞানের প্রতীক। এই অবস্থাপন্ন সাধক জ্ঞানী হন এবং তাঁর তখন হংসের অবস্থা হয়। জগতের সার বস্তুকে গ্রহণ করতে পারেন। এই অবস্থাপন্ন সাধককে পরমহংস বলে। তাঁর পাশে সিদ্ধিদাতা গণেশ। সাধক এত কঠোর সাধনা করল তাই তার সিদ্ধি অবশ্যই চাই। কিন্তু সাধক, যদিও সিদ্ধি বা মুক্তি তোমার সন্নিকটে, তথাপি সাবধান। নইলে তোমার ভেতর যেসব পাশব বৃত্তিগুলি এখনও

লুকিয়ে আছে তারা মাথা চাড়া দিতে পারে, তারা তোমার ক্ষতি করবে অথবা বাইরে যারা তোমার শত্রু, তারা তোমার শত্রুতাচরণ করবে, সাধনার ব্যাঘাত হবে। তাই সিদ্ধিদাতার বাহন ইঁদুর। ইঁদুরের ধর্ম অকারণে অনিষ্ট করা। সবার ওপরে বিশ্বনাথ। যিনি বিশ্বের নাথ তাঁর থাকার জায়গা নেই, বস্ত্র নেই, ছাই-ভস্ম মেখে শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকেন। এ হল সাধকের ত্যাগের প্রতীক। এই অবস্থাপন্ন সাধকের সবকিছু থেকেও কিছুই নেই, কারণ কোন দিকেই তাঁর আকর্ষণ বা মন নেই। তখন তাঁর 'জায়া থাকিতেও গৃহ শূন্য' অবস্থা।

এইভাবে যিনি আত্মসাধন করেন তিনিই মাকে পান এবং তাঁর সকল দুর্গতি নাশ হয়। তিনি তখন স্থির ব্রহ্মে সদা যুক্ত থাকায় নিজেই বিশ্বনাথ হন। এই চঞ্চল প্রাণই দুঃখদায়িনী ও সুখ-দায়িনী। সুখ অর্থাৎ সু=সুন্দর, খং=ব্রহ্ম। সুন্দররূপে স্থির ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই সুখ। তার আগে সুখ কোথায়? তাই দুর্গাপূজায় আমাদের সকলের প্রার্থনা—'জগৎজননী, অসুর দলনী মা, দুর্গতিনাশিনী মা, তুমি আমাদের সকলের দেহের ভেতরে আছ, তুমি আমাদের সকল চঞ্চলতা দূর করে, যাকিছু অশুভ নাশ করে, স্থিরত্বের দিকে নিয়ে যাও, তাহলেই আমাদের সুখ হবে।'

যে যাবার সে যাক্ বয়ে,
তুই আপন কর্ম করে যা,
তোর হবে ভাল শেষে
তুই স্থির ঘরে চলে যা।

শ্যামাচরণ ইধার আও

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নাম সুবিদিত। সারা পৃথিবীতে সত্যিকার অধ্যাত্মপিয়াসী মানুষ নিশ্চয়ই তাঁকে চেনেন, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে এই স্বল্প প্রবন্ধে বিশেষ পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রামানিক জীবনী গ্রন্থ 'পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী' বইটির প্রথম লাইনে 'শ্যামাচরণ ইধার আও' এই কথাটি লেখা আছে। এই একটি লাইন বসাতে আমার প্রায় ছয়মাস সময় লেগেছে। আজ ৯/১০ বছর হোলো বইটি বেরিয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ পড়েছেন। প্রায় সকল ক্রিয়াবানও এই পবিত্র বইটি পড়েছেন বলে আশাকরি। সাধারণ পাঠকের কথা না ধরলেও অন্তত ক্রিয়াবানদের কাছ থেকে ওই একটি লাইন সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু প্রশ্ন আশা করেছিলাম। ওই লাইনটির মধ্যে যে একটা গভীর অধ্যাত্ম রহস্য লুকিয়ে আছে সেদিকে কারও দৃষ্টি পড়েছে বলে মনে হয়নি। ইদানিং কালে এক দুজন ক্রিয়াবান আমার সামনে ওই লাইনটির গূঢ় অর্থ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করায় এই স্বল্প পরিসরে যতটুকু সম্ভব বলার চেষ্টা করছি।

লাইনটির মধ্যে দশটি অক্ষর আছে। এই দশটি অক্ষর হোলো দশ প্রাণ, দশদিক, দশ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির প্রতীক। এসবই প্রাণের

চঞ্চল অবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়। শ্যামাচরণ যখন পাহাড়ের পথে এগিয়ে চলেছেন তখন তাঁর প্রিয় গুরুদেব বাবাজী তাঁকে ডাকছেন। এ সময়ে শ্যামাচরণ হলেন জীব-শ্যামাচরণ অর্থাৎ তিনি তখন প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় বর্তমান অতএব উপরোক্ত দশ গুণগুলি তাঁর ভেতরে আছে। এই দশ গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণে অবস্থিত শ্যামাচরণকে ডাকছেন তাঁর প্রিয় গুরুদেব। যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, নিজেই ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েছেন তিনিই সদগুরু অর্থাৎ গুরু হলেন স্থির এবং শিষ্য হলেন চঞ্চল। এক্ষেত্রে নিশ্চল ব্রহ্ম ডাকছেন তাঁরই থেকে উৎপন্ন চঞ্চল ভাবাপন্ন জীব শ্যামাচরণকে। বলছেন, আমার কাছে এসো তাহলে তুমিও স্থিরত্বে পেঁছে যাবে। এই স্থির ব্রহ্মই হলেন সমস্ত সৃষ্টির উৎসস্থল। সবকিছু স্থির ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হয় এবং ঘুরে ফিরে সেখানেই মিশে যায়। তাই স্থির ব্রহ্ম সদাই আহ্বান করছেন চঞ্চলরূপী জীবকে যে একদিন না একদিন আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে, তবে আর দেরী করছ কেন? তুমি চঞ্চল হওয়ার দরুণ দশপ্রাণে বিভক্ত হয়েছ, তাই তোমার ভিতরে দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়েছে এবং একারণে তুমি দশদিক অর্থাৎ সকলদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এবার তুমি আমার কাছে এস এবং স্থির হও তাহলে তুমি চিরবিশ্রাম পাবে। অতএব এই আহ্বানটা যেমন শ্যামাচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাথে সাথে পৃথিবীর সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। ব্রহ্ম-শ্যামাচরণ মানুষকে ক্রিয়াযোগ শিক্ষা দেবার জন্য যখন মানুষ্যদেহ নিয়ে মর্তে আবির্ভুত হলেন তখন তিনি প্রাণের চঞ্চলতার দরুন নিশ্চয়ই জীব-শ্যামাচরণরূপে পরিণত হলেন। ফলে তিনি স্বয়ং

স্হির ব্রহ্ম হওয়া সত্ত্বেও নিজের পরিচয়কে ভুলে গেলেন। এই স্হিরত্ব সকলের ভেতরেই আছে, সেই স্হিরত্বই সকলকে আহ্বান করছে আমার কাছে এসো আর পরবাসে অর্থাৎ চঞ্চলতায় থেকো না। এইভাবে 'পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী' নামক পবিত্র গ্রন্হটির মধ্যে প্রতি ছত্রে সনাতন যোগধর্মের গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। ক্রিয়াবান পাঠক এই পবিত্র গ্রন্হটিকে যদি এভাবে নিতে পারেন তবে তাঁদের উপকার হবে বলে আশাকরি।

পবিত্র সেপ্টেম্বর

হে সেপ্টেম্বর, তুমি নিজেকে মহান্ পবিত্র ও অমর করে রেখেছ। ১৮২৮ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর অমৃতসন্তান যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে তুমিই ভারতভূমিতে এনেছিলে, আবার ১৮৯৫ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁকে তুমিই ফিরিয়ে নিয়ে গেছ। মানুষের আত্মীক কল্যাণের জন্য সত্যই তোমার প্রাণ কেঁদে-ছিল, তাই শ্যামাচরণের মাধ্যমে অভয় বাণী মানব সমাজে দিয়ে গেলে। শ্যামাচরণও তাঁর সম্পূর্ণ কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করে অমর ক্রিয়াযোগ সাধনার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন, যে সাধন করলে মানুষ নিজেই অমৃত হতে পারবে। তাই আজ আমরা যারা ক্রিয়াবান আছি আমাদের আত্মসমালোচনার সময় এসেছে;

আমরা তাঁর বাণী কতটুকু নিজের জীবনে এবং কতটুকুই বা মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাতে পারলাম। ক্রিয়াবানের দায়িত্ব কিছু কম নয়। সেই দায়িত্বটা কতখানি তা দেখা যাক।

আজ ধর্ম, সমাজ, শাসন ব্যবস্থা যেদিকে তাকান যায় চারিদিকে কেবল আসুরীক বৃত্তি। মঠ মিশন আশ্রম তীর্থস্থান সাধুসমাজ পূজাপাঠ কোন কিছুরই তো অভাব নেই, তবু কেন চারিদিকে এত অনাচার! এই জড়-বিজ্ঞানের যুগে কিছুতেই মানুষের মন উন্নত হচ্ছে না। আধুনিক সভ্যতা যখন মানুষের মনকে উন্নত করতে পারে নি, তখন তা কখনই শ্রেষ্ঠ নয়। একদিকে জড়-বিজ্ঞানের দুর্বার আকর্ষণ, অপরদিকে মঠ মিশন আশ্রম তীর্থস্হান সাধু-সমাজ তাঁরাও চেষ্টা করছেন জড়-বিজ্ঞানের পদলেহন করতে। ফলে ঐসব পবিত্র সংস্হাগুলি থেকে আত্মসাধন উঠে গিয়ে কেবল প্রচার, ভোগবিলাস, আরও প্রতিষ্ঠান বানাও, অন্যের আদর্শের চেয়ে আমাদের আদর্শই শ্রেষ্ঠ, কি করে মঠাধীশ হব, কোন্ কর্ম করলে লোকে আমাকে বড় সাধু বলে মানবে, কেমন করে পাশ্চাত্যদেশ ফেরৎ মহাত্মা হব, লক্ষ লক্ষ শিষ্য চাই ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত। ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলি চোখ ধাঁধানোভাবে রমরমা করে চলছে ঠিকই কিন্তু ঋষিদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেল। তাই এগুলি আর মানুষ-হংস তৈরী করতে পারছে না। সকল কর্মের মধ্যে তারা লাভ খুঁজে বেড়ায়। যে ভারতভূমিতে মানুষ সর্বত্যাগী সাধুদের আজও শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে, সেই সর্বত্যাগী সাধুরা কিন্তু একটা খেতাবের আশায় কর্ম করে। নিজের নামের আগে বিভিন্ন

বিশেষণে নিজেই নিজেকে ভূষিত করে। তাই বর্তমানে সাধু সমাজের মধ্যেও আত্মসাধনার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ ঋষিভূমি এই ভারতবর্ষে ঋষিরা সকল শাস্ত্রের মাধ্যমে কেবল আত্মজ্ঞানের কথাই বলে গেছেন। যোগিরাজও তাই বলেছেন। এই আত্মসাধন থেকে সরে যাওয়াতেই আজ মানুষের এত দুঃখকষ্ট। ভগবান্ বলেছেন—নহি কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। এই আত্মকর্মই হল কল্যাণ কর্ম। এর দ্বারা প্রমাণিত হল কি উপায়ে মানুষ তার অনন্ত দুঃখকষ্ট থেকে দূরে থাকতে পারে তার উপায় ঋষিরা বলে দিয়ে গেছেন। ঋষিরা ছিলেন সর্বজ্ঞ। তাঁরা মানুষের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব জানতেন এবং কোন্ কর্মের মাধ্যমে মানুষের স্থায়ী কল্যাণ হবে তাও তাঁরা বলে দিয়ে গেছেন, কিন্তু সেই উচ্চ আদর্শ থেকে ক্রমে মানুষ বিচ্যুত হয়ে প্রচার সর্বস্ব আত্মপরায়নহীন মানুষের কথায় বিভ্রান্ত হল. জড় বিজ্ঞানের দৌলতে প্রচুর ভোগের সম্মুখীন হল, যা ঋষিরা কখনোই চাননি। ঋষিরা জড়জগতের সুখভোগকে এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখভোগকে কখনোই গ্রহণ করতে বলেননি, যা আজ সর্বত্র বিদ্যমান। এহেন অবস্থায় ক্রিয়াবানের কি কর্তব্য ?

যোগিরাজ বলেছেন—ক্রিয়াবানই দেবতা। কারণ সকল দেবদেবী যে আত্মকর্ম করেন ক্রিয়াবানও তাই করেন। অতএব ক্রিয়াবানকে সকল দিক থেকে দেবচরিত্র হতে হবে। ক্রিয়াবানও তো এই সমাজের মানুষ। চারদিকে যখন আসুরিক বৃত্তিতে ভরে গেছে, ধর্মের নামে যখন সারাদেশ গোষ্ঠি এবং দলবাজিতে ভরে গেছে

তখন দেবচরিত্র সম্পন্ন ক্রিয়াবানদের এগিয়ে আসতেই হবে, নচেৎ মানব সমাজ আরও নীচে নেমে যাবে। কিন্তু দেখা যায় যে কালের প্রভাবের গতি এত ভয়ংকর যে এই দেবচরিত্র সম্পন্ন ক্রিয়াবানদের মধ্যেও আজ গোষ্ঠি দলবাজি এবং আপন স্বার্থ চরিতার্থতার দিকেই ঝোঁক বেশী। তাই ক্রিয়াবানরা যোগিরাজের দেয়া উচ্চাসন দেবচরিত্রকে ভুলে গিয়ে, যোগিরাজের মহান্ আদর্শ থেকে বহুলাংশে বিচ্যুত হয়ে, আমি অমুক গুরুর শিষ্য, আর সব ফালতু, এই বোধের শিকার হল। বর্তমানে এই আত্মসাধন পথের যাঁরা পথিকৃৎ অর্থাৎ গুরু হলেন তাঁরাও অনেকে আপন আপন গোষ্ঠী দল এবং আশ্রমকে বজায় রাখার জন্য নেশায় মত্ত হলেন। তাঁরা যোগিরাজের বাণীকে ভুলে গিয়ে নিজের বাণীকেই যোগিরাজের বাণী বলে চালাতে লাগলেন। যোগিরাজকে তাঁরা আপন গোষ্ঠী বা মঠ মিশন চালাবার মূলধন করে নিলেন। উন্নত ক্রিয়াবানের যে মহান্ দেবচরিত্র হওয়া উচিত ছিল তার থেকে তাঁরা বিচ্যুত হলেন। তাঁরা আপন আপন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগিরাজকে বেঁধে ফেললেন। হায় ক্রিয়াবান, যোগিরাজ কি আপনাদের এই আদর্শ দিয়েছেন?

যোগিরাজ বলেছেন—"জগতের এরূপ ব্যবহারে দুঃখ হয়। লোকে মান্য করুক এরূপ কর্ম করে। আমি বড় মেনে নিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু সকলের দাস হয়ে, সকলের নিকট ছোট হয়ে, সকলকে মান্য করে অভিবাদন করাতে সকলের মধ্যে যে কূটস্থ আছেন তাঁকে অনুমান করে সকল কাজ করা উচিত তা কেউ করে

না। সকল লোকে যাতে ক্রিয়া পায় তার চেষ্টা করা উচিত।" মানুষের মঙ্গলের জন্য সত্যই তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল, তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন—"ক্রিয়া করলে মঙ্গল, না করলে অমঙ্গল।" যে মানুষ ক্রিয়া করবে তার মন গলে যাবে। সে তখন সকল পার্থিব চাহিদার অতীতে থাকতে চাইবে। মনুষ্যত্বের যেসব গুণ সেগুলি আপনা হতে তার মধ্যে উদয় হবে। মানুষের চরিত্রগঠণের আন্দোলন, মঙ্গল করার আন্দোলন, উপকার করার আন্দোলন, সেবা করার আন্দোলন এসবকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি, কারণ তিনি জানতেন এসবই পার্থিব এবং অস্থায়ী। তিনি বলেছেন—"এই পাগলা মাতালের কথাটি শোন, দয়া করে ক্রিয়াটি কর।" তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন—"ক্রিয়া করলে সব পাবে।" এই যাঁর বাণী, যিনি সঠিক ক্রিয়া ছাড়া আর কোন দিকে নিজেও তাকাননি, অপরকেও তাকাতে উপদেশ দেন নি, অথচ হায়, বর্তমানে তাঁর প্রদর্শিত ও পরীক্ষিত সর্বমঙ্গলদায়ক যে ক্রিয়া তা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বর্তমানে অনেকেই নিজেদের মনগড়া কতকগুলো কর্ম যোগিরাজের প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ নাম দিয়ে চালায়। ফলে সঠিক ক্রিয়া লোপ পেতে বসেছে এবং মানুষ তৈরীর যে কারখানা সংসার, যেখানে উন্নত, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ তেমন আর তৈরী হচ্ছে না। যদি কারখানায় উন্নত মানুষ তৈরী না হয় তাহলে উন্নত সমাজ আশা করা যায় না। কিন্তু যোগিরাজ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যাতে সংসারে উন্নত মানুষ তৈরী হয় এবং তৈরী করার যে উপায় তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের অযোগ্যতার দরুন সেই শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেলাম, ফলে তাঁর

আদর্শ আমরা নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারলাম না, অপরকেও দিতে পারলাম না। তাই আজ সকল ক্রিয়াবানকে দলাদলি ভুলে গিয়ে মনেপ্রাণে এগিয়ে আসতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ মানুষ যোগিরাজের সঠিক আদর্শ পায়, সঠিক ক্রিয়া পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা না হলে যোগিরাজ কাউকেই ক্ষমা করবেন না। আর মাত্র কয়েক বছর পরে ১৯৫৫ খৃঃ তাঁর তিরোধান শতবর্ষ। তখন তাঁর শ্রীচরণে আমরা জবাব দিতে পারব না, মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে হবে।

হে মহান্ যোগিরাজ, তুমি স্বয়ং ভগবান, তুমি সকল সৃষ্টির মূল কারণ। তুমিই আত্মসূর্য্য, তুমিই নারায়ণ, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই মহাদেব, তুমিই কালী, তুমিই আদি পুরুষ ভগবান, তুমিই ঈশ্বর, তুমিই জগদীশ্বর, তুমিই সর্বব্যাপী। তুমি সকল মনুষ্য হৃদয়ে কূটস্থরূপে আছ, তুমিই একমাত্র পুরুষ, তুমিই অক্ষর পুরুষ, তুমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছু নেই, সর্বকালে সর্বাবস্থায় তুমিই বিরাজিত। তুমি নেই তো কিছু নেই। তোমার এই পরিচয় তুমিই দিয়ে গেছ। তাই তোমার কথা দিয়ে অর্থাৎ তোমাকে দিয়েই তোমার পূজা করি। তুমিই যখন সব, তখন আমার আমিটাও তুমি। তাই মহাষ্টমীর প্রাক্কালে, তোমার তিরোধান দিবসের প্রাক্কালে, তোমার শ্রীপাদ পদ্মে এই প্রার্থনা জানাই, আমাদের সকল প্রকার গোষ্ঠী ও দলাদলির ঊর্দ্ধে নিয়ে যাও, আমাদের সত্য ও আলোকের পথে নিয়ে যাও। তোমার মহান্ পথ থেকে আমাদের বিচ্যুত কোরো না, আমাদের মানু-হুঁস কর।

জীবসেবা কি মোক্ষদায়ক

বর্তমান পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত সম্প্রদায় আছে এবং তাদের কেন্দ্র করে যত মঠ, মিশন, আশ্রম, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা বা ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে এবং গত প্রায় এক হাজার বছর ধরে যত মহাত্মা মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন, সকলেই এই উপদেশ দিয়ে আসছেন যে, "জীবের সেবা কর, জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়, এই সেবা মোক্ষদায়ক" ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষের বা জীবের সেবার মধ্য দিয়ে সত্যই ঈশ্বরের সেবা হয় কিনা এবং মোক্ষদায়ক কি না; যদিও সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সকল মহাত্মাই এই আদর্শে গত প্রায় এক হাজার বছর ধরে নিজেরাও কাজ করছেন এবং মানুষকে ঐ কাজ করবার উপদেশ দিচ্ছেন। এই সেবা করে কে এবং কাকেই বা করে? মন বুদ্ধি চিন্তা ভাবনা এরাই সেবা করে এবং সেবা নেয়। এরা সকলেই ইন্দ্রিয়। এভাবে সকলে ইন্দ্রিয়ের সেবাই করছে। ইন্দ্রিয় কখনও অতীন্দ্রিয়ের সেবা করতে পারে না, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়। যে সেবা করছে সেও অস্থায়ী এবং যাকে সেবা করছে সেও অস্থায়ী। অস্থায়ী কখনও চিরস্থায়ীর সেবা করতে পারে না। ঈশ্বর চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। যে সেবা

করছে এবং যাকে সেবা করছে উভয়েই পরিবর্তনশীল। ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল। যে সেবা করছে এবং যাকে সেবা করছে উভয়েই প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় বর্তমান, ঈশ্বর অচঞ্চল। অতএব চঞ্চল কখনও অচঞ্চলের সেবা করতে পারে না।

যদি ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া হয় তাহলে তখনকার মত তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হল ঠিকই কিন্তু পরে তার আবার ক্ষুধা লাগবে। রোগীকে ঔষধ এবং পথ্য দিয়ে সারিয়ে তুললেও পুনরায় তার রোগ হবে। এরা সবাই মরণশীল অতএব অস্থায়ী। তাই ক্ষুধার স্থায়ী নিবৃত্তি হয় না এবং স্থায়ী নিরাময় সম্ভব নয়। তাছাড়া ক্ষুধা বা রোগ হয় কার? ক্ষুধা বা রোগ দেহের হয়, দেহীর নয়। দেহ অনিত্য দেহী নিত্য। একারণে অনিত্য কখনও নিত্যের সেবা করতে পারে না। অনেকে বলেন দরিদ্রনারায়ণ সেবা। তাহলে ধনীনারায়ণ সেবা নয় কেন? নারায়ণ কি কেবল দরিদ্রের মধ্যে আছেন, ধনীর মধ্যে নেই? আসলে দরিদ্রকে সেবা করার সুযোগ আছে, ধনীকে নেই। সারা বিশ্বে সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মের নামে কেবল কিছু সংস্কারমূলক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা স্থূল কর্ম নিয়েই ব্যস্ত। আত্মসাধন থেকে অনেক দূরে আছে। তাই তারা নিজেরাও পার্থিব সেবামূলক কাজে ব্যস্ত এবং অপরকেও এই শিক্ষা দিয়ে থাকে। কাউকে কিছু সেবা করতে গেলে, তা সে অন্নই হোক আর ঔষধই হোক, এসবই পার্থিব বস্তুর দ্বারায় সেবা করতে হয়। ঈশ্বর অপার্থিব, কাজেই পার্থিব বস্তুর দ্বারা তাঁর সেবা কখনই সম্ভব নয়। সেবা করতে

গেলে পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন হয়, কিন্তু ঈশ্বর কোন বস্তু নয়। অতএব কোন বস্তুর দ্বারা ঈশ্বর সেবা সম্ভব নয়। আবার সেবা করতে গেলেই দুই হল, ঈশ্বর এক। দুই কখনও একের সেবা করতে পারে না। কারণ দুইয়ের ভিতর সর্বদা একই বর্তমান, এক ছাড়া দুইয়ের অস্তিত্ব নেই। তাই এককে বাদ দিয়ে দুইয়ের কল্পনা যেমন অলীক তেমনি দুইয়ের মাধ্যমে একের সেবাও অলীক। দুই হলেই দ্বন্দ্ব, ঈশ্বর দ্বন্দ্বাতীত। অতএব দ্বন্দ্বের দ্বারা দ্বন্দ্বাতীতের সেবা সম্ভব নয়। যে সেবা করছে এবং যাকে সেবা করছে এই দুই হল। এই দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল। দ্বৈত কখনও অদ্বৈতের সেবা করতে পারে না। যে সেবা করছে সেও একের ওপর নির্ভরশীল এবং যাকে সেবা করছে সেও একের ওপর নির্ভরশীল। এক অর্থাৎ আত্মা। আত্মা না থাকলে সেবা করাও যাবে না, সেবা নেয়াও যাবে না। অতএব সেবার উৎসস্থল আত্মা। কিন্তু যখন কাউকে সেবা করার প্রয়োজন হয় তখন অবশ্যই দুই হয়—সেবা করার মত মন এবং সেবা নেবার প্রয়োজন, এই দ্বৈত অবশ্যই বিদ্যমান। অতএব সেখানে এক বোধ নেই। দ্বৈতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই সেবা কখনই অদ্বৈতের সন্ধান দিতে পারে না, তাই মোক্ষদায়ক নয়। আত্মজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে সেবা অলীক কল্পনা মাত্র। তাই সেবা বলতে যা কিছু বোঝায় তা জাগতিক কর্তব্য হিসাবে অবশ্য পালনীয় ঠিকই কিন্তু মোক্ষদায়ক হিসাবে পালনীয় নয়। মোক্ষই আসল। যদি কেউ মোক্ষ চায় তবে তার পক্ষে সেবা করাটা সময়ের অপচয় মাত্র। কিন্তু কেউ যদি বলে মোক্ষ চাই না তবে তা ফাঁকিবাজি। এ

বিষয়ে যোগিরাজ পরিষ্কার বলেছেন—"আপনার আসল সেবা ক্রিয়া ছেড়ে উপসেবা অর্থাৎ ফাল্‌তো ভেলকির ন্যায় কিয়ৎস্থায়ী ধোঁকায় পতিত হয়—এরূপ ধোঁকা কত খাইল—কিন্তু আপনি যে খোকা সেই খোকা কতবারই হইলেন।" আরও বলছেন—"আপনার ভাল নয় পরের ভাল—এই কুসংস্কারেতেই সর্বনাশ—আবদ্ধ হইয়া লোকে হইতেছে।"—মুক্তিকামী মানুষ প্রথমে নিজের সেবা করেন। নিজের সেবাই আসল সেবা। প্রাণের সেবা প্রাণকর্মের দ্বারাই সম্ভব। সেই প্রাণকর্মই হল ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার মাধ্যমেই আসল সেবা অর্থাৎ নিজপ্রাণের সেবা হয়। নিজপ্রাণের সেবা ছেড়ে দিয়ে বাহ্য জগতের যতপ্রকার সেবা সবই উপসেবা মাত্র। এই উপসেবা ভেল্‌কীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী কর্ম সর্বদা ধোঁকায় পতিত করে। অপরের সেবা করতে গেলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতেই হবে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে কর্ম করা হবে তা অবশ্যই ধোঁকায় পতিত করবে। এই ধোঁকারূপ কর্ম অনেক জন্ম ধরে কত করলে কিন্তু নিজে যে খোকা খোকাই রয়ে গেলে অর্থাৎ জন্ম জন্ম ধরে খোকা হয়ে কতবার এলে, কতবার গেলে, কত উপসেবা করলে কিন্তু খোকা হওয়া শেষ হল না, কারণ নিজের সেবা করলে না। সেবা করতে গেলেই গুণকে প্রয়োজন হয়, গুণের অতীতে যে নির্গুণ তা করলে না, এটাই তোমার মুর্খামী। এই প্রকারে সেবা করাটা কেবল কুসংস্কার মাত্র, আর এই কুসংস্কারেতে আছ বলেই তোমার সর্বনাশ হচ্ছে, কারণ তুমি গুণে আবদ্ধ হয়ে আছ, গুণাতীতের সন্ধান পেলে না। জাগতিক ভাবে নিজের সুখ দেখা এবং অপরের সুখ দেখা একই কথা। এসবই উপসেবা। কিছু

দিনের জন্য উপসেবাকে সত্য মনে হয়, কিন্তু এটা যে মিথ্যা তা বুঝতে পার না। এটাই তোমার কুসংকার এবং এই কুসংস্কারেই তোমার সর্বনাশ। তাই তুমি জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনছ। অতএব এসব সেবামূলক ধোঁকার কর্ম ছেড়ে দিয়ে নিজের সেবা কর অর্থাৎ আত্মক্রিয়া কর। জগতের বস্তু দেখতে সুন্দর কিন্তু পরিণামে বিষবৎ।

আমি সকলের দাস

দাস অর্থে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি বা চাকর। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যাঁরা তাঁদের কথা আলাদা, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের দাস। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ তারা কার দাস? একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে চাকর বা দাস হয়ে জীবন অতিবাহিত করে এবং শেষে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয় সেটাই এখানে আলোচ্য বিষয়, তাই দাস শব্দের দুটি অর্থ।

দাস অর্থে যখন চাকর বোঝায় তখন তার ধর্ম হল অপরের আজ্ঞা বহন করা। একটা শিশু যখন মাতৃজঠরে থাকে তখন সে প্রাণের স্থিরাবস্থায় অবস্থান করে এবং ওটাই তার মূল বা আদি অবস্থা। এই আদি অবস্থায় সে ঈশ্বরের দাস, এই অবস্থায় সে আত্মজ্ঞ। সেই শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে

প্রাণের আদি অবস্থা থেকে চঞ্চলতায় অবতরণ করল এবং চঞ্চলতার ফেরে পড়ে তার অধীনস্থ হল। এখন সে প্রাণের চঞ্চলতার দাসত্বে এসে গেল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হল অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসের অধীনস্থ হল। ধীরে ধীরে তার সকল ইন্দ্রিয় চালু হতে লাগল। কান শুনতে লাগল, চোখ দেখতে লাগল, হাত পা নাড়তে লাগল ইত্যাদি। দাসত্বের ধর্ম হল প্রভুর আজ্ঞামতে কর্ম করা, এখানে তার নিজের মত বলে কিছু থাকে না। এক্ষেত্রে শিশুটি কানে যা শোনে সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। তাই সে কানের দাস হল, কান তাকে যে দিকে খাটায় সে তাই করে। ধীরে ধীরে শিশুটি বড় হতে লাগল। এখন সে চোখে যা দেখে সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। তাই চোখ তাকে যেভাবে খাটায় সে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত তাই করে। হাত পা তাকে যেভাবে খাটায় সে নির্বিবাদে তাই করে। ধীরে ধীরে তার মন উৎপত্তি হল। এখন সে মনকেই প্রভু বলে জানল। এই মনের মধ্যে উৎপত্তি হল সুখ দুঃখ, হাসি কান্না ইত্যাদি। সে তখন এই মনের দাসত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কখনো হাসে কখনো কাঁদে। এবার উৎপত্তি হল বিবেক। সে তখন ভাল মন্দ বুঝতে লাগল তাই সে বুদ্ধি ও বিবেকের দাস হয়ে 'এটা পেলে ভাল হবে', 'ওটা পেলে মন্দ হবে' এইভাবে নির্বোধের মত ছুটতে লাগল।

এবার শিশুটি আরও একটু বড় হল অমনি পিতা মাতার দাস হল। পিতা মাতা সহ সকল অভিভাবক তখন তাকে বলতে লাগল—এটা কোরো না, ওটা কর, এটা ন্যায় ওটা অন্যায়, লেখা পড়া কর ইত্যাদি। শিশুটি তখন নির্বিবাদে সেই সব আদেশ

পালন করতে লাগল। সে তখন পিতামাতাসহ সকল অভিভাবকের দাস হল। এবার সে স্কুল ও কলেজে গেল, যেখানে শিক্ষকের দাস হল। লেখা পড়া শিখে চাকরী পেল, তখন সে অফিসের বড়কর্তাদের দাস হল। এখন থেকে সে অর্থেরও দাস হল। আরো অর্থ চাই, যশ চাই, প্রতিপত্তি চাই, সম্মান চাই, প্রতিষ্ঠা চাই ইত্যাদির পেছনে উদভ্রান্তের মত ছুটতে লাগল। অতএব সে তখন এইসব কামনার দাস হল। কাম ক্রোধ লোভ মোহ পরশ্রীকাতরতা সবই তার ভেতর একে একে উদয় হল। এরা সবাই তখন তাকে যা হুকুম করে প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত সে তাই করে। এখন সে ক্ষুধার দাস হল, পিপাসার দাস হল, দেহবোধের দাস হল। চারিদিক থেকে দাসত্বের বেড়াজাল তাকে ঘিরে ফেলল কিন্তু সে যে দাস নয়, সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন একথা ভুলে গেল।

এবার সে বিবাহ করল। স্ত্রী যা বলে সে তাই করে, তাই সে তখন স্ত্রীর দাস হল। তারপর তার সন্তান হল। স্নেহের বশবর্তী হয়ে সন্তান যা বলে, এটা চাই ওটা চাই, সে তাই করে; অতএব সে তখন সন্তানের দাস হল। তার তখন ভেতর এবং বাহির সবটাই পুরোপুরি দাসে পরিণত হয়েছে। তাই সে যে দাস নয়, সে যে স্বয়ং প্রভু এবং মহান্ তা সে ভুলে গেল। চারিদিক থেকে অসংখ্য প্রভু তার ওপর হুকুম চালাতে লাগল এবং সে তখন ওইসব প্রভুদের খুশী করার জন্য সদাই ব্যস্ত। তাই তার মনে কোনো কষ্ট নেই, ব্যথা নেই, কোনো অভিযোগ নেই। কারণ সে তখন পুরোপুরি দাস। তার প্রভু হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে না। এইভাবে একদিন মৃত্যুরূপী প্রভু এসে বলল—আমার সঙ্গে

চল। সে অনায়াসে সেই আজ্ঞা পালন করল। এইভাবে অনন্ত জীবন ঘুরতে ঘুরতে কোনো একটা জীবনে এসে নিভৃত স্থানে কপালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল—আমি কি সত্যই দাস, নাকি আমি স্বয়ং প্রভু? এবার এই জিজ্ঞাসা তার ভেতরটাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। এখন সে আর দাস হয়ে থাকতে চায় না, কারণ সে জন্ম জন্ম ধরে বহু দাসত্ব করেছে। কিন্তু কি করে এখন সে দাসত্বের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবে এবং নিজেই প্রভু হবে সে পথের সন্ধান জানে না। সে তখন ছটফট করতে লাগল। এমন সময় তার সামনে এসে উপস্থিত হলেন এক আত্মজ্ঞ পুরুষ, যিনি নিজে এই সমস্ত দাসত্বের থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের দাস হয়েছেন। এবং নিজেই নিজের প্রভু হয়েছেন। সে তখন সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা জানাল—এবার আমায় দয়া করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করুন। সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ তখন তাকে দেখিয়ে দিলেন এক অপূর্ব আত্ম সাধনার পথ। তিনি বলে দিলেন এই পথ ধরেই আমি অনন্ত দাসত্বকে অতিক্রম করে এখন স্বাধীন হয়েছি। তুমিও এই পথ ধরে স্বাধীন হও। এটাই সকলের চলার পথ এবং সঠিক পথ।

প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই দাসত্ব এবং স্থির অবস্থাই স্বাধীন বা প্রভুত্ব। অনন্ত সর্বব্যাপী ব্রহ্মশ্যামাচরণ এভাবে সকলের মধ্যে প্রাণের অনন্ত চঞ্চলতারূপে দাস হয়ে আছেন, আবার সকলের মূলে উৎস হিসাবে স্থিররূপে প্রভু হয়ে আছেন। তিনি না থাকলে দাস ভাবও নেই, প্রভু ভাবও নেই, এই উভয় অবস্থাই তিনি। তাই তিনি বলেছেন—"আমি সকলের দাস।" চঞ্চলরূপে দাস হয়ে আমিই সকলকে বন্ধনে রাখি, আবার স্থিররূপে প্রভু হয়ে আমিই সকলকে স্বরূপে আনি।

ভারত শাসন

এই ঐতিহ্যশালী ভারতে অতীতে অনেক মহান্ মহান্ রাজা এই দেশকে শাসন করেছেন এবং মানুষের কল্যাণ করেছেন। তাঁরা সকলেই সনাতন ধর্মের অনুশাসন মেনে দেশকে শাসন করেছেন তার নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনেক রাজা হয় নিজেরা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন অথবা কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বা মুনিঋষিদের কাছে জ্ঞান নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। যেমন রাজা জনক নিজে ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন এবং সকল ব্রহ্মজ্ঞ মুনিঋষিদের সমাদর করতেন। রামায়ণের যুগে দেখা যায় প্রায় সব রাজারা ধর্ম এবং ধর্মের অনুশাসন মেনেছেন। মহাভারতের যুগেও তাই দেখা যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম রক্ষার্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। আরও পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত, শিবাজী প্রভৃতি তারাও ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের ছত্রছায়ায় থেকে দেশ শাসনের কাজ করেছেন। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে বিশদ বলতে পারেন। তবে এটা ঠিক যে ভারতের ঐতিহ্য হোল সনাতন ধর্ম এবং তার অনুশাসন মেনেই অতীতে প্রায় সকল রাজারাই দেশ শাসন করেছেন এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ঠিক তার উল্টোটাই দেখা যায়। বর্তমানে যাঁরা রাজা অর্থাৎ শাসক সম্প্রদায় তাঁরা সনাতন

ধর্মের ধার ধারেন না এবং অনুশাসনও মানেন না। বর্তমানের শাসক সম্প্রদায় কেবল দলবাজি, গোষ্ঠীবাজি এবং গদি দখলের মোহে অন্ধ। শাসক সম্প্রদায় হলো সাধারণ মানুষের কাছে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁরা যেভাবে সাধারণ মানুষকে উপদেশ দেন সাধারণ মানুষ সে ভাবেই চলে। তাই শাসক সম্প্রদায়ের উচিত ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, চরিত্রবান হওয়া এবং শাস্ত্র সম্মত ধর্মের অনুশাসন মেনে চলা। অতীতে শাসক সম্প্রদায় এইভাবে চলতেন বলে এই মহান্ ভারত গৌরবের উচ্চশিখরে ছিল। কিন্তু কালবশে শাসক সম্প্রদায় ধীরে ধীরে এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বার্থান্বেষী এবং কুচক্রী মন নিয়ে দেশ শাসনে অবতীর্ণ হওয়ায় আজ ভারতের এই দুর্দশা। ফলস্বরূপ বর্তমান কালের শাসক সম্প্রদায়ের এই কলুষিত মনের দ্বারায় মানুষের হিত সাধন সম্ভব হচ্ছে না। শাসক সম্প্রদায় কালজয়ী সনাতন ধর্মের চেয়েও রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিলেন, ফলে দেশবাসীও সেই পথেই চলছে। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সনাতন ধর্মের উচ্চ আদর্শের জ্ঞান না থাকায় ভারতের বাইরে থেকে আমদানি করা গ্লানির অধ্যায়ে স্থাপিত ক্ষণস্থায়ী চাপিয়ে দেওয়া ধর্মগুলোকেও এক করে ফেললেন, যা কখনই হবার নয়। তাই ভারতের মানুষ আজ বিভ্রান্ত। ভারতের মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতা এখনও পায় নি। সনাতন ধর্ম হলো স্ব-ধর্ম বা আপন ধর্ম, এই ধর্ম্ম কখনও ভেদ শিক্ষা দেয় নি। তাই এখন ভারতের মানুষকে ফিরে পেতে হবে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ আপন ধর্মকে। যেহেতু সত্যযুগ আগত তাই এই দিকেই ভারত এগিয়ে চলেছে।

একে বাধা দেবার ক্ষমতা স্বার্থান্বেষী শাসক সম্প্রদায়ের নেই। এটাই সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী। অতীতের রাজারা ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি অনুসারে দেশকে চালাবার চেষ্টা করতেন, বর্তমানে শাসক সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুসারে বহু পুরাতন ঐতিহ্যশালী ভারতকে চালাবার চেষ্টা করছেন। যুগ যুগ ধরে সনাতন ধর্ম্মের মহীরুহের যে শিকড় ভারতের বুকে গেড়ে গেছে তাকে সরিয়ে ভারতের বাইরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যে এখানে শিকর গাড়তে পারেনা এই জ্ঞান বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের নেই। ফলে দুই নৌকায় পা দেওয়ার মত ভারত এখন টলমল করছে। শাসক সম্প্রদায় অজ্ঞতার দরুণ না পারছেন নিজস্ব ঐতিহ্যে ফিরে যেতে, আবার না পারছেন পুরোপুরি ভারতের বাইরের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে। তাই এখন ভারতের মানুষের উচিত যত তাড়াতাড়ি বাইরের ধর্ম্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আপন ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া। তাহলেই তার মঙ্গল হবে। আপন মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর কাছে পুষ্টিদায়ক, তেমনি স্বধর্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম মানুষের কাছে মঙ্গলদায়ক। সৎমায়ের দুগ্ধ যেমন শিশুর কাছে সম্পূর্ণ পুষ্টিদায়ক নয়, তেমনি আত্মধর্ম ব্যতীত মানুষের তৈরী ক্ষণস্থায়ী বিদেশী ধর্ম্মও ভারতের মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। তাই ভগবান শ্যামাচরণ এই দিকে ভারতের মানুষকে আহ্বান করে বলেছেন—"যোগী হতে গিয়ে এত দুর্বল হৃদয় কেন? নদীর জল আর গাছতলা তো কেউ নেয়নি। অর্থে সুখ কারো হয়নি হবে না। সবাই অর্থের জন্য চিঁ চিঁ করছে।" সনাতন ভারতের মানুষকে তিনি জানালেন যে অধিক ধন দৌলতের মাধ্যমে

স্থায়ী সুখ কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের মানুষ বর্তমানে পাশ্চাত্য নীতি অনুসারে অধিক ধনের দিকেই এগিয়ে চলেছে। এখান থেকে ভারতের মানুষকে বেরিয়ে এসে যোগী হতে হবে। যোগী হতে গেলে জীবনে অধিক ধনের প্রয়োজন নেই। জীবন চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ কর এবং আত্মসাধন পরায়ণ হও। তাই ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের উচিত যাতে এই মহান্ ঐতিহ্যশালী ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষ আত্মধর্ম্মের দিকে এগিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

রাজনীতি চিরকালই যুদ্ধবিগ্রহ বা কুচক্রের মাধ্যমে বহু মানুষের জীবন নিয়েছে কিন্তু সনাতন ধর্ম চিরকালই শান্তির বাণী শুনিয়েছে এবং মানুষকে আত্মজ্ঞানের দিকে প্ররোচিত করেছে। তাই সনাতন ধর্ম্মের শান্তির পতাকাতলে ভারতের সব মানুষকে পুনরায় আশ্রয় নিতে হবে, তবেই ভারতের মঙ্গল হবে। ভারত ধীরে ধীরে সেইদিকে আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতের মানুষ যতই দরিদ্র ও অশিক্ষিত হোকনা কেন আজও তারা অন্তত একটা বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের নামগান করে। তারা যতই দরিদ্র হোকনা কেন তাদের কোন অভিযোগ নেই, তাদের সহনশীলতা অপরিসীম। এখান থেকে ভারতের মানুষকে সরিয়ে এনে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণকারী শাসক সম্প্রদায় সেই চেষ্টাই করছেন, তা কখনই হবার নয়। মহান ভারত তার আপন ঐতিহ্য থেকে কখনই সরে যাবে না, একথা ভগবান শ্যামাচরণ সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সনাতন শাস্ত্র অনুসারে মানুষকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এই চারটি ভাগ জন্মগত অনুসারে নয়, গুণগত অনুসারে যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, দয়াশীল, ক্ষমাশীল, শান্ত এবং স্থিরচিত্ত তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি সর্বদাই সত্ত্বগুণে অথবা গুণাতীতে অবস্থিত। যিনি ব্রাহ্মণের বুদ্ধি নিয়ে, প্রজাবৎসল মন নিয়ে দেশ শাসন করেন এবং বহিঃ শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেন তিনি ক্ষত্রিয়। বহিঃ শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা বলতে কি কেবল দেশের মাটিকে রক্ষা করাই বোঝায়? ঠিক তা নয়। দেশের মাটিকে রক্ষা করা, দেশের মানুষকে রক্ষা করা, দেশের সম্পদকে রক্ষা করা, দেশের ধর্ম্ম ঐতিহ্য সব কিছুকেই রক্ষা করা বোঝায়। দেশের শাসক সম্প্রদায়ের এইসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। বিশেষ করে দেশের ধর্ম ও ঐতিহ্য বিষয়ে। কিন্তু তা বর্তমান কালে দেখা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে মহান্ ভারত বিদেশী শাসনের কবলে থাকায় তার নিজস্ব ধর্ম ঐতিহ্য এসব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে। বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন থাকায় ভারতের যেগুলো নিজস্ব সম্পদ যেমন ধর্ম ঐতিহ্যসংস্কৃতি এগুলোর মধ্যেও বিদেশী প্রভাব ঢুকে গিয়ে বর্তমানে একটা খিচুড়ি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাই আজ দেশে এত সমস্যা। কাজেই শাসক সম্প্রদায়ের উচিৎ এই খিচুড়ি অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করা। অতীতে ক্ষত্রিয়গণ অর্থাৎ শাসকশ্রেণী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ ও সঠিক বুদ্ধি নিয়ে এসব দিক থেকে দেশকে রক্ষা করতেন। কিন্তু এখন তার বিপরীতই দেখা যায়। এখন শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সে চেষ্টা ও জ্ঞান নেই বললেই চলে। তাই ক্ষত্রিয় রজোগুণের অধিকারী। এই রজোগুণসম্পন্ন মানুষ সদাই কর্মবীর

হন। যিনি বৈশ্য তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর ধন আহরণ করেন এবং দেশকে ধনী হতে সাহায্য করেন। বৈশ্য রজ তম গুণের অধিকারী। বৈশ্য সব কর্মের মধ্যেই ফল কামনা করে থাকেন। যিনি শূদ্র তিনি উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা করেন। শূদ্র তমো-গুণের অধিকারী হওয়ায় দাস মনোভাবাপন্ন এবং নিদ্রা, আলস্য, আজেবাজে নেশা করে থাকেন। মোটামুটি চারবর্ণের এই বহিঃ-প্রকাশ। এই চারবর্ণের অন্তঃপ্রকাশ হল— ব্রাহ্মণ সদাই সাধন পরায়ণ, শুচিশীল, ক্ষমাবান, দয়াশীল, ইন্দ্রিয় ও রিপুর জয়কারী এবং ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ সদাই ক্রিয়ার পরাবস্থায় অবস্থিত। ব্রাহ্মণ সদাই শান্ত, সমাহিত, নিরুদ্বিগ্ন, জ্ঞানবান এবং স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি ক্ষত্রিয় তিনি সদাই ক্রিয়াতে অনলস চিত্ত, ধীর, ইন্দ্রিয় ও রিপুদের জয় করার জন্য সদাই সচেষ্ট এবং ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে চালিত। যিনি বৈশ্য তিনি ক্রিয়া করেন বটে, কিন্তু ফল কামনার সহিত। তাঁর কখনও ক্রিয়ার দিকে মন আবার কখনও জাগতিক ভোগ্যবস্তু লাভের দিকে মন। এ কারণে বৈশ্য রজস্তম গুণের অধিকারী। যিনি শূদ্র তিনি আত্মসাধন অর্থাৎ ক্রিয়া করেন না, করতেও চান না। তিনি সদাই অলস, কর্মবিমুখ নিদ্রালু, নেশাখোর, আজ্ঞাবাহী, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও ভোগী হন।

সনাতন ধর্ম অনুসারে অতীতে ভারত ব্রাহ্মণের উপদেশে ক্ষত্রি-য়ের দ্বারা পরিচালিত হত। তাই ভারত গৌরবের উচ্চশিখরে প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছিল। কালবশে ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রাণতরঙ্গের নিম্ন অভিমুখী অবস্থার দরুণ যখন গ্লানির কবলে পড়ল তখন থেকে ক্রমান্বয়ে বৈশ্য এবং শূদ্রের হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত হল।

ফলে জ্ঞানী-গুণীর সমাদর কমে গেল, অধিক ভোগবিলাস বাড়তে লাগল। রাজনীতির মধ্যে অধিক কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা, অসহিষ্ণুতা অধিকমাত্রায় স্হান পেল। ক্ষমা দয়া তিরো-হিত হল। অহমিকা, উচ্চাকাঙ্খা, অধিক নেশা ইত্যাদি আসন পাকা করে নিল। গ্লানির অধ্যায় এইভাবে ধীরে ধীরে ভারত সহ সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হল। এ কারণে বর্তমান ভারত গ্লানির জন্য শূদ্র শাসিত হওয়ায় আর গৌরবের উচ্চাসনে থাকতে পারল না। কলিযুগের শেষে ধর্ম্মের যে গ্লানির অবস্হা তার জন্যই এই পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাই বর্ত্তমান ভারত সহ সারা পৃথিবীতে হিংসা ও ক্রোধের অনল জ্বলছে। এবার যেহেতু কলিযুগ এবং গ্লানির অধ্যায় শেষ হয়ে পৃথিবীর প্রাণতরঙ্গ নিকট ভবিষ্যতে সত্যযুগে পদার্পণ করছে তাই রাজনীতিরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ভারত যেহেতু সারা পৃথিবীর মধ্যে ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু তাই এখান থেকেই প্রথম পরিবর্ত্তন শুরু হবে এবং অনতিবিলম্বে যখন ভারত পুনরায় ব্রাহ্মণের উপদেশে ক্ষত্রিয়ের দ্বারায় শাসিত হবে তখনই ভারত তার আপন গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। গ্লানির অধ্যায়ে শূদ্র শাসনের জন্য যে অধঃপতন অবস্হার সৃষ্টি হয়েছিল সে সব চলে যাবে এবং শান্তি ক্ষমা দয়া ইত্যাদি যাকিছু মানব জীবনের সুন্দরতম দিক তা আবার ফিরে আসবে। সে দিন আর বেশী দেরী নেই। তাই ভগবান শ্যামাচরণ মানুষকে সেই দিকেই যাবার জন্য আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন এই আত্মবিদ্যা অর্থাৎ ক্রিয়া করতে থাক তাহলে ধীরে ধীরে সকলের জীবনে শূদ্রত্বের অবস্হা থেকে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। কলিযুগ এবং তার গ্লানির অধ্যায়

হলো সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আর সত্যযুগ হোল সবচেয়ে ভাল অবস্থা। অধিক মন্দের পর অধিক ভালোর দিকে যখন পৃথিবীর প্রাণতরঙ্গ এগিয়ে যায় তখন একটা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এখন পৃথিবীতে এই যুগ পরিবর্ত্তনের সময় চলছে, তাই চরম অশান্তির শেষে চরম শান্তি ফিরে আসবে। এটা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ গ্লানির অধ্যায়ে যা আবির্ভূত হয়েছিল তা আর কিছুই থাকবে না। এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনকে শাসক সম্প্রদায় যদি মেনে নিতে সচেষ্ট হন তাহলে দেশে অশান্তি কম হবে।

মটরু

ও মিনতি, সারাদিনে মটরুকে একটু ঘাস জল দিয়েছিলে ?

না দিইনি, তুমিই যেন সারাদিন সব সামলাচ্ছ। তুমি সংসারের কতটুকু দেখ ? অমনি অমনি মটরু আছে ? চেঁচিয়ে ওঠে মিনতি।

আহা বেচারা, সারাদিন পেয়ারা গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে। রাম ভুলে যায় ক্লান্তির কথা। এগিয়ে যায় মটরুর দিকে।

ও মটরু তোর বড় কষ্ট না রে ? গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে রাম। মটরু ততক্ষণে দু'পা রামের কোমর পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। প্যা—প্যা।

চল্ তোকে দুটো পাতা খাইয়ে আনি। কি পাতা খাবি বল, কাঁঠালপাতা খাবি? আচ্ছা তাই চল্। পেয়ারা গাছের গোড়া থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে এগিয়ে চলে রাম। পাশেই একটা কাঁঠাল গাছ থেকে কয়েকটা পাতা ভেঙ্গে নিয়ে বলে খা—খা। জল খাবি? আয়। মাটির গামলা করে জল এনে দেয় মটরুকে। মটরু আনন্দে নাচতে থাকে।

প্রতিদিন সকালে একটা দা নিয়ে কাজে বেরোয় রাম। জন-মজুরির কাজ। কোনদিন মেলে, কোনদিন মেলে না। যেদিন মেলে আট-দশ টাকা হয়। আয় বলতে এ টুকুই। স্ত্রী মিনতি এবং একটি পাঁচ বছরের ছেলে কেষ্ট। মিনতি কত কষ্ট করে সংসার চালায়।

আজ ঘোষবাবুদের বাড়ীতে কাজ পেয়েছিলাম। দশটাকা রোজ পেয়েছি। তার থেকে এক কিলো চাল এনেছি আর এই বাকী টাকা তোমার কাছে রাখ। চাল এবং টাকা এগিয়ে দেয় মিনতির দিকে।

এতক্ষণে মিনতির মুখে একটু হাসি ফুটল। মিনতি ভাবছিল, বেচারা খেটে খুটে এল। ঘরে একটা চাল নেই. অভুক্ত লোকটাকে কি খেতে দেবে? ছেলেটাও সারাদিন কিছু খায়নি। গাছ থেকে একটা পেঁপে পেড়ে ছুলে দিয়েছিল, ছেলেটা তাই খেয়ে সারাদিন আছে। নিজের কথা চিন্তাই করে না মিনতি।

যতই অভাবের সংসার হোক না কেন. সকলেরই মনে কিছু না কিছু সখ থাকে। রামের বড় সখ যেভাবেই হোক সে একটা ছাগল কিনবে। ছাগলটা সারাদিনে যা দুধ দেবে তা ছেলেটা খাবে।

কিরে রাম, তোর এই ছাগলটি তো বেশ বড় হয়েছে। এর তো এখন বেশ দাম হবে।

গদাইকাকা বিড় বিড় করে হিসাব করতে থাকে। তা আট-দশ কিলো হবে।

এবার গদাইকাকা ধমকের সুরে বলে—ছেলেটার অসুখ, ঘরে একটা টাকা নেই, কেন ছাগলটা বিক্রী করে ডাক্তার দেখাতে পারছিস না?

রামের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে—কার কাছে বিক্রী করব গদাইকাকা?

তোর মত বোকা কোথাও দেখিনি। কসাইদের কাছে বিক্রী করলে বেশী দাম পাওয়া যায়। আচ্ছা আমি একটা কসাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখিস ওরা আবার অনেক সময় ঠকিয়ে দেয়। ভাল করে দামদস্তুর করে তারপর বিক্রী করবি।

আচ্ছা আমি যাচ্ছি। তবে দেখিস ডাক্তারের কাছে যেতে বেশী দেরী করিস না। অনেক সময় সর্দি বসে নিমোনিয়া হয়।

বেলা বারটার সময় একটা কসাই আসে। এটা কি রামের বাড়ী? তুমি নাকি একটা খাসি বিক্রী করবে শুনলাম। আমি ন্যায্য দাম দিয়েই কিনব, একপয়সাও কম দেব না। গদাইকাকা যখন পাঠিয়েছেন ন্যায্য দাম দিতেই হবে।

প্যা প্যা। পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে মঠরু রামের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়!

রাম ছুটে যায় কেষ্টর কাছে। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। আবার এক লাফে উঠোনে এসে মটরুকে

কোলে তুলে নেয়। কিরে মটরু জল খাবি? এই নে জল খা। এলুমিনিয়ামের বাটিটা এগিয়ে দেয়। মটরু মনের আনন্দে জল খায়।

ছাগলটা তোমাদের বড় আদরের? একটাই খাসি আছে নাকি —রহিম জিজ্ঞাসা করে।

একটাই আছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না রামের।

ঠিক আছে, একশো টাকা দাম দিলাম। গদাইকাকা যখন পাঠিয়েছেন তখন এক পয়সাও কম দেবার উপায় নেই।

রামের কানে যেন কথাগুলি ঠিকমত ঢুকছে না। একবার ফিরে তাকায় কেষ্টর দিকে, আবার মটরুর দিকে। এতক্ষণে মটরু এসে রামের বুক পর্যন্ত দু'পা তুলে দিয়েছে। প্যা—প্যা।

দেখ রহিম, আমি ছাগলটাকে বিক্রী করতে পারব না।

আমাকে গদাইকাকা সব বলেছেন। এই টাকা নিয়ে তোমাকে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। দেরী করলে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাবেন। আবার কাল ডাক্তারবাবুকে পাবে। এত দেরী করা তোমার উচিত নয়। আচ্ছা এই নাও একশোদশ টাকা দিচ্ছি, আর কথা বোল না।

রাম কাঁদবে কি হাসবে, সব ভুলে গেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। আর সে ভাবতে পারে না।

এতক্ষণে রহিম একটা সরু দড়ি দিয়ে মটরুর গলাটা বেঁধে ফেলেছে।

দাওয়া থেকে কেষ্ট লাল লাল চোখ দিয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ

চেঁচিয়ে উঠল—না, আমার মটরুকে দেবে না। অমনি মিনতি ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

রাম নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে থাকল পেয়ারা গাছের তলায়। ধীরে ধীরে মটরুর প্যা প্যা ডাক মিলিয়ে গেল কোন্ দিগন্তে।

* * * *

রহিম সরু দড়ি দিয়ে টানতে টানতে মটরুকে নিয়ে এল তার দোকানে। তারপর চারপায়ে দড়ি বেঁধে মটরুকে পেড়ে ফেলল; আর একজন চেপে ধরল। মটরুর আর নড়বার উপায় নেই। মটরু দেখছে রহিমের হাতের চকচকে ধারাল ছুরিটা এগিয়ে আসছে তারই দিকে ·····।

মটরু আর কোনদিনও ঘাস পাতা খাবে না, প্রাণভরে শ্বাস নেবে না, মায়ের কোলে নাচবে না। মটরুর আত্মা একবার রামকে জিজ্ঞাসা করে- কিগো রাম, কেষ্টর জ্বর ছেড়েছে? আর কোন-দিন অসুখ করবে না তো? আমি কি তোমার সন্তান ছিলাম না? রহিমকে জিজ্ঞাসা করে—কিগো রহিম, তোমার অভাব গেছে? আর কোনদিন অভাব হবে না তো? যদুদের জিজ্ঞাসা করে—কিগো, তোমাদের দেহের পুষ্টি হয়েছে? আর কোনদিন অপুষ্টি হবে না তো?

এইভাবে মটরু সকলকে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়—আমি তোমা-দের সকলকে ভালবাসতাম, বিশ্বাস করতাম। আমার ভালবাসায় কোনদিন ভেজাল ছিল না, কপটতা ছিল না। তোমাদের আশ্রয়টা-কেই নিজের আশ্রয় এবং নিরাপদ বলে জানতাম। আমিও চেয়ে-ছিলাম তোমাদের মত মায়ের কোলে নেচে বেড়াব, কিন্তু তোমাদের

তা সহ্য হল না। তোমরা আমার সরল বিশ্বাস ও ভালবাসাকে নিয়ে ব্যবসা করেছ, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেছ। আমি তোমাদের কাছে কোনদিনই কৈফিয়ৎ চাইব না, কারণ তোমাদের আমি ভালবাসি।

মটরুর কান্না আজও থামেনি, মানুষের কাছে সুবিচার পায়নি, বোধহয় কোনদিনই পাবে না। এইভাবে মটরু জন্ম জন্ম ধরে নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মানুষের সেবা করছে।

—সমাপ্ত—